চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্ররূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প-দ্বিতীয় পর্যায় :

রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন

রাজা

রবীন্দ্রপ্রতিভার রূপক-সাংকেতিক পর্বের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি রাজা নাটকটি। অভিনব বিষয়বস্তু ও সংকেতের চমৎকারিত্বে রাজা নাটকে যে অধ্যাত্মরসের সৃষ্টি হয়েছে এক কথায় তা অতুলনীয়। 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', ও 'গীতালি' পর্বে রাজা নাটকটি রচিত হয়। যে অধ্যাত্মসাধনা কাব্যগুলির মধ্যে আছে তারই অন্য রূপ নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকে মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। খেয়া কাব্যের 'আগমন' কবিতায় 'আঁধার ঘরের রাজা' বা 'দুঃখরাতের রাজা'র উল্লেখ আছে—

"ওরে, দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা, শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।"[১]

'আগমন' রচিত হয়েছিল ১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৮ শ্রাবণ। খেয়া কাব্যের প্রকাশ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। পক্ষান্তরে রাজা নাটকটি রচনার তিনমাস পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। 'আগমনে'র 'আঁধার ঘরের রাজা'ই যে রাজা নাটকের মূল প্রেরণা তা বলাইবাহুল্য।

নাটকটির ইংরেজি তর্জমার সময় রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন "The King of the Dark Chember"[২] অর্থাৎ 'আঁধার ঘরের রাজা'।

কাহিনিটি বৌদ্ধজাতকের কুশ জাতক থেকে খানিকটা রূপান্তরিত হয়ে রাজা নাটকের জন্য গৃহীত হয়েছে। মূল কাহিনিটি হলো—

মল্লরাজ ইক্ষ্বাকুর বড়ো ছেলে কুশ শক্তিশালী, বুদ্ধিমান কিন্তু দেখতে খুবই কুৎসিত। ছোটো ছেলে রূপবান কিন্তু বুদ্ধিমান নয়। মদ্র রাজকন্যা পরমা সুন্দরী প্রভাবতীর সঙ্গে কুশের বিয়ে হয়। বংশের একটি কুলপ্রথা-এক সন্তানের মা না হওয়া পর্যন্ত দিনের আলোয় বধূর স্বামীর মুখ দেখা নিষেধ—মিথ্যে এই কুলপ্রথার দোহাই দিয়ে কুশের মা শীলবতী কুশ ও প্রভাবতীকে দিনের বেলা মিলতে দিতেন না। কেবল রাতের বেলাতেই তাদের দেখা হতো। প্রভাবতী বারবার শাশুড়িকে অনুরোধ করতে লাগলো। তখন রানী ছলনা করে কৌশলে রূপবান ছোটো ছেলেকে দেখালেন। কিন্তু রাজ-উদ্যানে একদিন কুশের সঙ্গে প্রভাবতীর দেখা হলো। কুশের কদাকার মুখ দেখে প্রভাবতী চিৎকার করে উঠল। তারপর রাগে ও বিরক্তিতে কুশকে পরিত্যাগ করে পিতৃগৃহে চলে গেল। প্রভাবতীর বিচ্ছেদে কুশ ব্যথিত হলো। সে প্রভাবতীকে ফিরিয়ে আনার জন্য ছদ্মবেশে মদ্ররাজের রাজধানীতে গেল। সেখানে রাজহস্তিশালায় প্রবেশ করে বীণা বাজাতে লাগলো। প্রভাবতী বীণার মধুর ধ্বনি শুনে কুশের আগমনবার্তা টের পেলো। কুশ তারপর কুম্ভকার, রাজমালাকার প্রভৃতির গৃহে শিক্ষার্থী সেজে বিভিন্ন খেলনা ও মালা তৈরি করে প্রভাবতীর কাছে পাঠাতে থাকলো। কিন্তু প্রভাবতীর মন গলল না। শেষে নিরুপায় কুশ শ্বশুরালয়ে পাচকের কাজ গ্রহণ করলো। প্রভাবতী ছাড়া এ খবর কেউই টের পেলো না। কিন্তু এত কিছুর পরেও প্রভাবতীর মন কুশের প্রতি আগের মতোই বিরূপ হয়ে থাকলো।

এদিকে প্রভাবতীর স্বামীত্যাগের খবর পেয়ে তাকে লাভের আশায় সাতজন রাজা নগরে এসে হাজির। কিন্তু এক প্রভাবতীকে সাতজনকে দেওয়া সম্ভব নয়। মদ্ররাজ ক্ষোভে প্রভাবতীকে সাত টুকরো করার সিদ্ধান্ত নিলেন। রানী কেঁদে ভাসালেন। তাঁর মনে হতে লাগলো, কুশরাজ থাকলে অনায়াসে সাতরাজাকে পরাস্ত করে প্রভাবতীকে এই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারতো। প্রভাবতী কুশের অবস্থান প্রকাশ করলো। পরিশেষে কুশ

সাতরাজাকে পরাজিত করে মদ্ররাজের অনুমতি নিয়ে তাঁর অন্য সাতকন্যাকে সাতজন রাজার হাতে সমর্পণ করলো। এভাবে সে বীর্যগুণে প্রভাবতীর মন জয় করে নিলো।

এই মূলগল্পটির কাঠামোকে গ্রহণ করে তার মধ্যে বিয়োজন, সংযোজন ও রূপান্তর ঘটিয়ে "অত্যন্ত আধুনিক, আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সগোত্র"[৩] রাজা নাটকটি রচিত হয়েছে। শ্বশুরালয়ে কুশের পাচকবৃত্তি, সাত সামন্তরাজার সঙ্গে প্রভাবতীর সাত বোনের বিয়ে ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ বাতিল করেছেন। স্বয়ম্বর সভার আয়োজন, সেখানে সাতজন রাজার মধ্যে কেবল একজনকে চয়ন এবং সুদর্শনাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কাঞ্চীরাজ কর্তৃক সুবর্ণকে ছত্রধর নিয়োগ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও সৃষ্টিশীল সংযোগ। সূক্ষ্ম ও সৃষ্টিশীল সংবেদনার সঙ্গে নাট্যকারের দার্শনিক জীবনবোধ যুক্ত হয়ে রাজা নাটকটি মহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। নাটকটির অভিপ্রায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শঙ্খ ঘোষ তাঁর লেখায় উদ্ধৃত করেছেন—

> "তোমাদের মনের সঙ্গে বিশ্বের যোগ হয় এই ইচ্ছে ছিল। এই ইচ্ছেও কাজ করছিল যে বসন্তের আনন্দ ও তাৎপর্য এই নাটকের ছলে তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে।... ধরো, সুদর্শনার স্বামী বসন্ত। গাছের মজ্জায়, ধরণী ধুলোয় রসসঞ্চার করে দিচ্ছে যে আনন্দ তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে হলে কী করে দেখব। আমি বসন্তকে বললুম, তুমি আসো নিতি নিতি, তোমাকে আশেপাশে ইঙ্গিতে পাই, তোমাকে ধরব আমি। বসন্ত বলল, বেশ, আমি সব জায়গায় আছি, আমাকে ধরো। যে ফুল ঝরল, যে পাতা গজাল, সব জায়গাতেই বসন্ত। এখনে বসন্ত ঋতুর সঙ্গে রাজার প্যারালেল আছে। ... তাঁকে ছিন্ন করে এক জায়গায় কনফাইন করে দেখতে পারি না। ... কেউ টাকা জায়গা জমির মধ্যে তাঁকে পেতে চায়। ... সুদর্শনা চঞ্চল। মনে করে আমার কত আদর তাঁর কাছে। তাই অহংকার।"[৪]

অল্প বয়সে সুদর্শনার রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়। সুদর্শনার স্বামী হবেন একজন পৃথিবীধন্য ব্যক্তি—এ রকম কথা এক গনৎকার সুদর্শনার মাকে পূর্বেই বলেছিলেন। বিয়ের সময় সুদর্শনা বা তাঁর মা কেউই রাজাকে ভালো করে দেখেন নি। রাজপ্রাসাদে এক অন্ধকার ঘরে রাজার সঙ্গে সুদর্শনার দেখা হয়। আলোর ঘরে সবার আনাগোনা। অন্ধকার ঘরে রাজার সঙ্গে একাকী

মিলনে সুদর্শনা মোটেই খুশি নন। রাজাকে বাইরের আলোতে প্রকাশ্যে দেখার বাসনা সুদর্শনার মনে গেঁথে বসে।

অন্ধকার ঘরের একজন দাসী আছে, তার নাম সুরঙ্গমা। মা-হারা সুরঙ্গমা পিতার প্ররোচনায় যৌবনে নষ্ট হওয়ার পথে যায়। রাজা তাকে উদ্ধার করেন। সুরঙ্গমা রাজাকে সেজন্য বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সুরঙ্গমার কাছ থেকে সুদর্শনা রাজার রূপের খবর জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুরঙ্গমা জানায় যে রাজা, "—সুন্দর নয়। সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত, এমন আশ্চর্য।"[৫] কিন্তু সুরঙ্গমার কথা তিনি ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি আলোর মধ্যে রাজাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হন। রাজা বলেন—

> "আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে-চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।"[৬]

বসন্ত পূর্ণিমার উৎসব। রাজ্যের প্রজাকুলের ভিড়। বহু দেশের বহু রাজা এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। রাজা এর আগে কোনোদিনই প্রজাদের সামনে আসেন নি। তাই প্রজাদের অনেকেই মনে করে—

> "বিরূপাক্ষ।...রাজাকে দেখতে বড় বিকট, সেইজন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।"[৭]

আবার অনেকের মনে রাজার অস্তিত্ব নিয়েই সংশয়। বিদেশি দলের একজনের কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি—

> "ভবদত্ত। ... আসল কথাটা হচ্ছে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।"[৮]

প্রজাদের বা বিদেশি দলের এ জাতীয় মনোভাব ও সংশয়ের ফাঁক গলে সুবর্ণ নামে এক ছদ্মবেশী মায়ামৃগ নিজেকেই রাজা বলে ঘোষণা করে। কিন্তু কাঞ্চীরাজ সেটা ধরে ফেলে। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে পেতে চায়। তাই সে সুবর্ণকে নিয়ে মস্ত একটা ফন্দি আঁটে।

রানী সুদর্শনা সুপুরুষ সুবর্ণকে রাজা মনে করে দাসী রোহিণীর মাধ্যমে পদ্মপাতায় করে পুষ্প অর্ঘ্য পাঠালেন। কিন্তু সুবর্ণ রানীর উপহারের মর্ম বুঝে উঠতে পারে নি। সুবর্ণ এ সবের মানে না বুঝলেও সুচতুর কাঞ্চীরাজের লোভাতুর চোখে সবই ধরা পড়ে। সেজন্য সুকৌশলে সুবর্ণর গলা থেকে মুক্তোর মালা খুলে সেটাকেই রাজকণ্ঠের মালা স্বরূপ রোহিণীর হাত দিয়ে সুদর্শনার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সুবর্ণ পুতুলের মতো কথা না বলে বসেছিল। তাকে রানীর দানের মর্ম বুঝিয়ে দিতে হয়েছে শুনে সুদর্শনার মনে সাময়িক অভিমান ও আত্মগ্লানি হয় ঠিকই কিন্তু সুবর্ণর রূপে তিনি তখনও আত্মহারা—

> "আজ এমন করে আমার দর্পচূর্ণ হয়েছে, তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছি নে। অভিমান আর রইল না-পরাভব, সর্বত্রই পরাভব-বিমুখ হয়ে থাকব সে শক্তিটুকুও নেই।"[৯]

রানীকে পাওয়ার আশায় কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে ব্যবহার করে। সুদর্শনার প্রাসাদের বাগিচায় তাকে দিয়ে আগুন লাগায়। দ্রুত সেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুদর্শনা সুবর্ণের কাছে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মিনতি জানান—

> "...রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।
>
> সুবর্ণ। কোথায় রাজা। আমি রাজা নই।
>
> সুদর্শনা। তুমি রাজা নও!
>
> সুবর্ণ। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড।..."[১০]

মায়ামৃগ নকল রাজা সুবর্ণ সুদর্শনার জীবনে মরীচিকা হয়ে দাঁড়ায়।

হতাশ হয়ে সুদর্শনাকে পুনরায় প্রাসাদের অন্ধকার ঘরে ফিরতে হলো। রাজা তাঁকে অভয় দিলেন। সুদর্শনা অপরাধ স্বীকার করলেন কিন্তু রাজার কালো রূপ তাঁর অপছন্দ সে কথাও জানাতে ভুললেন না। তাই তিনি রাজাকে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

অনর্থের আশঙ্কায় কন্যার স্বামীত্যাগ কান্যকুব্জরাজকে অপ্রসন্ন করে তোলে—

"নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। ... আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি। সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে নিয়ে আসছে।"[১১]

সেজন্য পিতার আশ্রয়ে সুদর্শনাকে দাসী হয়ে থাকতে হলো। তাঁর রানীর অহংকার চূর্ণ হয়ে ধুলোয় মিশে গেল। মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি এখন পুরোপুরি নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে আবদ্ধ।

সুদর্শনা সুবর্ণর রূপে মজে গিয়ে ভুল করেছিলেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন এ রূপ বাহ্যিক, এর সঙ্গে অন্তরের কোনো যোগ নেই তখন বিস্মিত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন—

"ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এত বড়ো বঞ্চনা করেছি? লজ্জা! লজ্জা!"[১২]

কাঞ্চীরাজসহ মোট সাতজন রাজা সুদর্শনাকে লাভের আশায় তাঁর পিত্রালয়ে এসে হাজির হয়। কান্যকুব্জরাজকে তারা পরাস্ত ও বন্দি করে। সাতজন রাজার মধ্যে কে সুদর্শনাকে পাবে সেই নিয়ে স্বয়ম্বর সভার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে কাঞ্চীরাজের ছত্রধর সুবর্ণের হীনদশা দেখে সুদর্শনা অনুতপ্ত বোধ করলেন। এদিকে ঠাকুরদা এসেছে অদৃশ্য রাজার সেনাপতিরূপে। যুদ্ধে সাতরাজার হাত থেকে সুদর্শনার উদ্ধার ঘটলো। রাজা অন্য রাজাদের দণ্ড দিলেও তাঁর অদ্ভুত বিচারে কাঞ্চীর পরাজিত রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেওয়ায় নাগরিকেরা অভিভূত। সুদর্শনা ভেবেছিলেন স্বয়ং রাজা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তা হলো না। "নিষ্ঠুর"[১৩] রাজার কাঠিন্যের কাছে অভিমানী সুদর্শনাকে হার মানতে হলো। সুরঙ্গমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন—

"বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে! কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে, আমিই তার

কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি, দক্ষিণে হাওয়া বেদনার মত হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না।"[১৪]

সুদর্শনা রাজার কঠিন অভিমানের কথা বলেছেন কিন্তু তিনিও যে কম অভিমানী নন সেটা গোপন থাকে নি। এমনকি তাঁর অভিমানের মধ্যে গর্বও ধরা পড়েছে—

"... তার পণটাই রইল, পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব, চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।"[১৫]

কাঞ্চীরাজের মনের মধ্যেও বদল লক্ষ্য করা যায়। সেও পথে বেরিয়েছে। তাকে পথে বের করা হয়েছে তার আত্মজাগরণের নিমিত্তে—

"আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে। যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে; আর, আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।"[১৬]

থালায় মুকুট সাজিয়ে তাই কাঞ্চীরাজকেও দেখা যায় রাজার মন্দির খুঁজতে রাতের বেলা পথে বেরিয়ে পড়েছে।

পথে নেমে এসেছে ঠাকুরদাও। সুদর্শনাকে পথে দীনবেশে দেখে তার মন খারাপ—

"এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি। একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।"[১৭]

সুদর্শনা ঠাকুরদার প্রস্তাব মেনে নিলেন না—

"না না না। সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন, সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন-বেঁচেছি, বেঁচেছি। আমি আজ তাঁর দাসী—যে কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।"[১৮]

অবশেষে পথ পার হয়ে প্রাসাদের সেই অন্ধকার ঘরে সুদর্শনা প্রবেশ করলেন। সেখানে রাজার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তিনি রাজার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিলেন—

"সুদর্শনা। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে, আমার রানীর ঘরে, তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম-সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।"[১৯]

এখন সুদর্শনার কাছে সুন্দর-অসুন্দর, আলো-অন্ধকার সবই সমান। তিনি জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অন্তরের অসীমালোকে পৌঁছে গেলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন—

"সুদর্শনার পরিণতির ক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। আদিতে, সৌন্দর্য-উপভোগের জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা; মধ্যে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া নৈতিক অবনতি, লালসার অগ্নিকাণ্ড, প্রবৃত্তির বিদ্রোহ; শেষে, দ্বন্দ্বাবসানে মাধুর্যে আত্মদান এবং আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি, ঐশ্বর্যের বদলে দৈন্যকে স্বীকার এবং নিখিল জগতের মধ্যে সেবার অধিকার-লাভ। সৌন্দর্য হইতে ধর্মনীতিতে এবং ধর্মনীতি হইতে আধ্যাত্মিকতায় এই-যে উত্তরণ, ইহা এমন ধাপে ধাপে না ঘটিলে আত্মার পক্ষে অন্ধকার হইতে আলোকে আসা কোনোমতেই সম্ভাবনীয় ছিল না। সুদর্শনার ইতিহাস আত্মার এই অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাস এবং অভিনব soul dramaর প্রধান নাট্যবস্তু।"[২০]

'রাজা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপ-রতন'-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নাটকের সারমর্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন সেটি রাজা নাটকের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য—

> "সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণর রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, —সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে—প্রভু কোনো বিশেষরূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে—প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"[২১]

নাটকের মধ্যে দুঃখ-বেদনাকে অতিক্রম করে অমৃতলোকে পৌঁছনোর কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত—

> " "রাজা" নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তারপর সেই ভুলের মধ্য দিয়ে, পাপের মধ্য দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির

পথ। তাই উপনিষদে আছে, তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।"[২২]

দুই

নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রাজা নাটকের চিত্রকল্পপুঞ্জ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মুনশিয়ানা তুলনারহিত। রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্ব যা এই নাটকের মূল বিষয় তা আলো এবং অন্ধকারের চিত্রকল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটকের সূচনাদৃশ্যেই বাইরের আলোয় রাজাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য সুদর্শনা একান্ত ব্যাকুল। তাই অন্ধকার ঘরে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। এভাবে নাট্যকার সূচনালগ্নেই সুকৌশলে আলো-অন্ধকারের চিত্রকল্পের মাধ্যমে নাটকের দ্বন্দ্বকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। আবার আলো ও অন্ধকারকে অনুসরণ করে অন্যসব চিত্রকল্প নাটকে স্থান করে নিয়েছে।

নাটকের সূচনায় দেখা যায় রানী সুদর্শনা আলোকে আশ্রয় করেছেন রাজার রূপদর্শনের অভিলাষে। সেজন্য তাঁর সংলাপে—যা নাটকের প্রথম সংলাপও বটে—কামনা ও বাসনার এক রক্তমাংসের রমণীর রূপ ধরা পড়েছে—

"সুদর্শনা। আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।"[২৩]

এর প্রত্যুত্তরে দাসী সুরঙ্গমা জানিয়েছে—

"সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার ঘরে-ঘরেই তো আলো জ্বলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না।"[২৪]

এভাবে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার কথোপকথনে নাটকের প্রারম্ভেই ধরা দিয়েছে আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্য। সুরঙ্গমার কথায় ফুটে উঠেছে অন্ধকারের তাৎপর্যময় ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতপূর্ণ অন্ধকারের তাৎপর্য আরও সম্প্রসারিত রূপ পেয়েছে সুরঙ্গমার পোড় খাওয়া জীবনের

অভিজ্ঞতায়। কিন্তু রূপ-তৃষ্ণায় মত্ত ও কাম-তৃষ্ণায় জর্জরিত সুদর্শনার পক্ষে এই তাৎপর্য বোঝা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়—

> "সুদর্শনা। না, না, আমি আলো চাই-আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।"[২৫]

আসলে নাটকের প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে রানী সুদর্শনার মধ্যে অন্ধকারের তাৎপর্য অনুভবের মন ও মানসিকতা আরোপ করতে চান নি। সেটা নাটকের গতির পক্ষে এবং শিল্পের প্রশ্নে মূর্তিমান বিপর্যয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে দাঁড়াতো। নাটকের প্রয়োজনে সেই অনুভব অবশ্য পরবর্তীতে সুদর্শনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। নাটকের পরিণতি পর্বে রাজার সংলাপে আলোর চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে মুক্তির সূর্যোদয়ের কাল—

> "রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম। এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো-আলোয়।"[২৬]

তখন আলো-অন্ধকারের চিত্রকল্প তার বিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে নাট্যকারের সৃজনের উদ্দেশ্যকে সাধিত করে তুলেছে। কিন্তু এই পর্বে অনভিজ্ঞ রানী সুদর্শনা অন্ধকারের তাৎপর্য জানেন না। দাসী সুরঙ্গমা জীবনের অভিজ্ঞতায় সেটা খুব ভালো করেই জানে। সুরঙ্গমার কাছে অন্ধকারের তাৎপর্য তাই ধরা দিয়েছে এভাবে—

> "সুরঙ্গমা। ... আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন 'সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো, এই তোমার কাজ' তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম—আমি মনে মনেও বলি নি, 'যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও।' তাই যে কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না।..."[২৭]

আলো-অন্ধকারের চিত্রকল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রানী ও দাসীর বৈপরীত্যও যেন ধরা পড়েছে। অন্ধকার সুদর্শনার কাছে মিথ্যা হতে পারে, কুহক হতে পারে কিন্তু সেই একই

অন্ধকার সুরঙ্গমার কাছে আলোর মতো পরিষ্কার। যাপিত জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতায় সেই অন্ধকার সুরঙ্গমার কাছে ধ্রুবসত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী সুন্দর বলেছেন—

> "'রাজা' নাটকে অন্ধকার ধ্রুবচেতনার দিক, জীবনকে গভীরতার মধ্যে উপলব্ধি করবার দিক। এ অন্ধকার রূপময়, আনন্দঘন, আলোর চেয়েও বেশি আলোকময়। এতে আছে মুক্তির চরিতার্থতা, মিলনের ব্যঞ্জনা।"[২৮]

অন্ধকার বিনে যে আলোর কোনো মূল্য নেই সুদর্শনা সেটা বুঝতে চান না বা বুঝতে পারেন না। তাই প্রতিমুহূর্তে আলোর এক অলীক পৃথিবী তাঁর একান্ত অন্বিষ্ট। আলোর মিথ্যা আকর্ষণে তিনি পতঙ্গের ডানার মতো চঞ্চল, তিনি মাতোয়ারা—

> "সুদর্শনা। ... আমার মন আজ এমনি চঞ্চল হয়েছে, এমন তো কোনোদিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারি দিকে উপচিয়ে পড়ছে, আমাকে যেন মাতাল করে তুলেছে।..."[২৯]

রাজার সঙ্গে কথোপকথনে সুদর্শনার মধ্যে অন্তর্জ্বালা ধরা পড়েছে—

> "সুদর্শনা। ...যখন চার দিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম, এই মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বললে, ঐ হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন আগুনে ঝাঁপ দিলুম। আমিও মরি নে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা!"[৩০]

শান্ত সুরঙ্গমার আচরণ সুদর্শনার মধ্যে রাগের সঞ্চার ঘটায়। তিনি বলে ওঠেন—

> "সুদর্শনা। ... কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে-সমস্ত ছারখার হয়ে যাক! অতবড়ো রানীর পদ এক মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম, সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে। মশাল জ্বলে উঠবে না? ধরণী কেঁপে উঠবে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে পড়া। সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না।"[৩১]

সুদর্শনার আছে আলোর প্রতি এক দুর্দমনীয় টান। সেই টানেই তাঁর আলোর প্রতি এমনতর চুম্বকের মতো প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা। 'পূর্ণিমার চন্দ্রালোক', 'আগুন', 'মশাল', 'রক্তবর্ণ নক্ষত্র' এইসব চিত্রকল্প সুদর্শনার আলোর প্রতি আকর্ষণের অনুষঙ্গেই নাটকে প্রযুক্ত হয়েছে। রাজার রূপদর্শন বা সুদর্শনার মনের গভীরে 'সুদর্শন' রাজার যে ছবি ধরা আছে তাকেই প্রকাশ্যে দেখার জন্য তাঁর আলোর প্রতি এই আকুতি, এই ছটফটানি।

জীবনের বাহ্যিক আড়ম্বর সুদর্শনার মনের মধ্যে জায়গা পেয়েছে। তাই উল্লিখিত আলোর চিত্রকল্পগুলি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চৈতালি সাহার মতে—

> "বাইরের জীবনের আড়ম্বর এবং আনন্দই সুদর্শনার জীবনে একমাত্র সত্য—এই চাঁদের আলো, আগুন, মশাল এবং নক্ষত্রের প্রতিমা সেদিকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু এই আলো যে সত্য আলো নয় একদিন তিনি তা বুঝতে পারেন। লক্ষণীয়, এইসব উল্লেখের সময়ে সুদর্শনার মুখে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে একটা উগ্রতা আছে, জীবনের প্রশান্ত কোনো উপলব্ধি নেই। পূর্ণিমার আলো তাঁর কাছে মদের ফেনার মতো, এ আলো তাঁকে সৌন্দর্যের চেয়ে মত্ততা দেয় বেশি। অথবা সুদর্শনা নিজেকে পতঙ্গ বলেই ঘোষণা করেন, আগুনে ঝাঁপ দেবার আস্ফালন জানান। জীবনের আগুনে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দিতে হয়েছে তাঁকে, আর তখনই মৃত্যু হয়েছে তাঁর পতঙ্গ বৃত্তির এবং সত্য মানবিক স্বভাব জেগে উঠেছে।"[৩২]

সুদর্শনা সুরঙ্গমাকে বলেছিলেন, "না, না, আমি আলো চাই—আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।"[৩৩] এই বলার মধ্যে অর্থাৎ এই আলোর চিত্রকল্পে সুদর্শনার উগ্র রূপ-তৃষ্ণা ও কাম-তৃষ্ণার ছবিটি ধরা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আলোর চিত্রকল্প মুক্তপ্রাণের অনুষঙ্গে ধরা দিয়েছে। যেমন—

> ১. "সুরঙ্গমা। রানীমা, ঐ দেখো, পূর্ব দিকে চেয়ে দেখো, ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই মা-তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।"[৩৪]

> ২. "ঠাকুরদা। ভোর হল দিদি, ভোর হল।"[৩৫]

৩. "সুদর্শনা। ... ঐ-যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।"[৩৬]

৪. "সুরঙ্গমা। ঐ-যে সূর্য উঠল।"[৩৭]

নাটকে রাজার শেষ সংলাপটি আলোর এক গভীরতম প্রজ্ঞার স্মারক। বর্তমান আলোচনায় যার উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে।

"রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম। এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো-আলোয়।"[৩৮]

সুদর্শনার অহংকার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ এক মানবীমূর্তির জাগরণ ঘটেছে। এবার তিনি সত্যপথে সমস্ত আড়ম্বর ভুলে গিয়ে রাজার কাছে এসে উপনীত হয়েছেন—সত্যিকারের 'আলোয়'।

সুদর্শনার আলোর প্রতি একান্ত প্রেম আছে। সেজন্যই অন্ধকারের ভাষা তাঁর কাছে সহজ হয়ে ধরা পড়ে নি। তিনি অন্ধকারের মহত্ত্বকে আবিষ্কার করতে অপারগ। নাটকের শুরুর দিকে সুরঙ্গমার সঙ্গে কথোপকথনে তাই আলোর জন্য সুদর্শনার মনে তুমুল ছটফটানি—

১. "কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।"[৩৯]

২. "তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থই বোঝা যায় না..."[৪০]

আগেই উল্লেখ করেছি যে অন্ধকারের অর্থ বোঝার ক্ষমতা রানীর পক্ষে এই পর্বে অসম্ভব। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি তা পরে উপলব্ধি করেছেন এ কথা বলাইবাহুল্য। একই অন্ধকার কিন্তু সুদর্শনা ও রাজার দৃষ্টিকোণ থেকে তার পৃথক অভিব্যঞ্জনা—

"রাজা। দেখতে পাই, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!"[৪১]

"সুদর্শনা। ... এই-যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, যা আমার উপর ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো, তোমার দিকে তার কিছুই নেই!..."[৪২]

দু'জনের জীবনবোধের গভীরতার বৈপরীত্য এই দুই উক্তিতে ধরা পড়েছে। সেজন্যই রাজার কালো রূপ সুদর্শনার কাছে অসহ্য। তিনি সেই রূপে একই সঙ্গে ভীত ও সন্ত্রস্ত—

"সুদর্শনা। ...ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো। ...ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো—"[৪৩]

অন্ধকারের প্রতি সুদর্শনার বিরাগ এখানে স্পষ্টতই প্রতীয়মান—

"সুদর্শনা। ... কেন আমাকে লোকে বলেছিল, তুমি সুন্দর! তুমি যে কালো, কালো-তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি—তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর।"[৪৪]

এই উক্তিতে রানীর অপছন্দ ও পছন্দের দিকটি ধরা দিয়েছে।

সুদর্শনার সৌন্দর্যকল্পনায় রাজা ধরা দিয়েছেন এই দীর্ঘ উক্তিতে এবং অজস্র চিত্রকল্পের সমবায়ে—

"সুদর্শনা।... নববর্ষার দিনে জল-ভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন বসে বসে মনে করি, আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়া-মাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার, শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয়, তুমি স্নান

করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হাল্কা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতরমহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন-এক অনেক দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই—যে সমস্ত বন রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।”[৪৫]

সুদর্শনা গহনমনের অন্ধকারের এবং অহংকারের পথ ধরে রাজাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন তাই খুঁজে পান নি। কিন্তু সমস্ত অহংকার যেদিন বিসর্জন দিতে পেরেছেন সেদিনই পরম অনুপম রাজাকে খুঁজে পেয়েছেন। লোহাকে পুড়িয়ে যেমন ইস্পাতে রূপান্তরিত করা হয় ঠিক তেমনই বিভিন্ন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে সুদর্শনার মনে এই উপলব্ধি এসেছে যে, বাইরের রূপ, দম্ভ, লালসা, কামনা, ভোগবাসনা ইত্যাদি সত্য নয়। অন্ধকারের ভেতর দিয়েই তিনি জীবনের প্রকৃত সত্যকে চিনতে পেরেছেন। অন্ধকারের আসল তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন। মুক্তি ও মিলনের সেই অন্ধকার নতুন তাৎপর্যে অসীমালোকে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর রূপান্তরিত জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্ধকার তাই—

“সুদর্শনা। আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসরঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান, তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।”[৪৬]

এই উক্তিতে একটা ইন্দ্রিয়াতীতের সুর যেন ধরা দিয়েছে। ধরা দিয়েছে অনন্তকালের মহিমান্বিত ছবি। এখানে ফুটে উঠেছে রহস্যময়তার ইঙ্গিত। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে অন্ধকারের মহত্তর অতীত। অন্যত্র সুদর্শনার উক্তিতে অন্ধকারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও একান্ত ব্যাকুলতার ছবি ধরা দিয়েছে এভাবে—

"সুদর্শনা। দেহে আমার কলুষ লেগেছে, এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি-বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না। তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতর আজ শূন্য হয়ে রয়েছে-সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না। তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু, আসুক—সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর, তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে। সে তুমিই, সে তুমি।"[৪৭]

ঠিক এর পরেই ধ্বনিত হয়েছে রানীর কণ্ঠের মহাসংগীত—

"সুদর্শনা। এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,

ওহে অন্ধকারের স্বামী!

এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে,

আমার চিত্তে এসো নামি।

এ দেহমন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা,

ওহে অন্ধকারের স্বামী!

বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা

ওই চরণে যাক থামি।

নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে,

ওহে অন্ধকারের স্বামী।

সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে,

ওহে আমি বাঁধনকামী।

আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,

ওহে অন্ধকারের স্বামী—

সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে চরম,

ওগো মরুক-না এই আমি।"[৪৮]

এভাবে 'মরুক-না এই আমি'-র মাধ্যমে অহংকারের এবং আমিত্বের ধ্বংসলীলা সাঙ্গ হয়েছে। সুদর্শনা নবরূপে, নব-আবেগে এবং নব-উপলব্ধিতে অন্ধকারের স্বরূপ বুঝে নিয়েছেন। তাই নাটকের অন্তিম দৃশ্যের অন্তিম বাক্যে সুদর্শনা নবচেতনায় অন্ধকারের কাছে প্রণত হয়েছেন—

> "সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।"[৪৯]

সন্দেহ নেই, আলো ও অন্ধকারের চিত্রকল্পই রাজা নাটকের কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প। তবে এ নাটকে আগুনের চিত্রকল্পের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। সে কারণে আগুন চিত্রকল্পটি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। আগুন ধ্বংস করে। আগুন সাধারণভাবে জীবনের বিপন্নতার দিকটিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে, অন্তত রাজা নাটকে এই বিপন্নতার দিকটি আগুন চিত্রকল্পের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাসাদের চারপাশে কাঞ্চীরাজ যে আগুন লাগায় সেই আগুনে

সুদর্শনা পুড়ে মরতে চান। রোহিণী যখন বলে, "তোমার অন্তঃপুরের চার দিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না"[৫০] তখন সুদর্শনা বলেন—

"সুদর্শনা। আমি তারই মধ্যে প্রবেশ করব। এ আমার মরবারই আগুন।"[৫১]

আগুন এখানে সুদর্শনার উক্তিকে ভিন্ন তাৎপর্যে উন্নীত করেছে।

সুদর্শনার কামনা-বাসনাকেও নাটকে আগুন চিত্রকল্পের মাধ্যমে ধরা হয়েছে। আগুনের কাছে সুদর্শনা পতঙ্গের মতো ধেয়ে গেছেন। রূপের নেশায় তিনি কামাতুর। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়—

"সুদর্শনা। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন সুদ্ধ ঝলমল করছে।"[৫২]

আগুন সুদর্শনার লজ্জা প্রকাশেরও আধার হয়ে উঠেছে—

"সুদর্শনা। লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ-চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।"[৫৩]

আবার কখনো বা অনুশোচনার আগুনে তিনি দগ্ধ হয়েছেন। তাই রাজাকে বলেছেন—

"সুদর্শনা। ... আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন আগুনে ঝাঁপ দিলুম।"[৫৪]

আগুনের মধ্য দিয়ে সুদর্শনার মধ্যে ক্রোধেরও বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

"আমার মধ্যে একটা রাগের আগুন জ্বলছে—আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি নে।"[৫৫]

আগুন ছাড়াও বীণাচিত্রকল্পটি নাটকের মূলভাবনার গতিদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সুদর্শনার চরিত্রের তিনটি দিক এই নাটকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত—

রাজাকে রূপের মধ্যে দেখার জন্য তাঁর মনে যে আকুলতা তারই ফলে জন্ম নিয়েছে রূপজমোহ। দ্বিতীয়ত—বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাঁর এই রূপজ মোহভঙ্গ ঘটেছে। তৃতীয়ত—রূপজ মোহের মেঘ সরে গিয়ে মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছে পবিত্রতার চিরন্তন ব্যঞ্জনা।

রাজার সঙ্গে সুদর্শনার মিলনের জন্য ব্যাকুলতা ও বীণাচিত্রকল্প :

"সুদর্শনা।... বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়।"[৫৬]

"সুদর্শনা। ... আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে, আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজছে।"[৫৭]

সুদর্শনার মোহভঙ্গ, পবিত্রতায় উত্তরণের ইঙ্গিত এবং বীণাচিত্রকল্প :

"সুদর্শনা। ... এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে। এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা-এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন, আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেইরকম।"[৫৮]

আপাত সুন্দরের প্রতি সুদর্শনার প্রীতিপূর্ণ মনোভাব। সুন্দরের কল্পরাজ্যে তাঁর অবস্থান। সেজন্য রাজা তাঁকে সতর্ক করে বলেছেন—

"রাজা। তা মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বুদবুদের মতো শূন্য।"[৫৯]

কিন্তু রাজার সাবধানবাণী সুদর্শনা কানে তোলেন নি। রাজাকে তাঁর মনে হয়েছে—

"সুদর্শনা। ... কী কঠিন, কী কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি—বুক ফেটে গেল-কিন্তু নড়ল না।..."[৬০]

পাথর ও বজ্রের চিত্রকল্পে সুদর্শনা রাজাকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু রাজার প্রকৃত স্বরূপ তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। রাজার সেই প্রকৃত রূপের ছবি আমরা পেয়ে যাই ঠাকুরদার অসামান্য একটি উক্তিতে—

"ঠাকুরদা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।"[৬১]

রাজনিশান হলো রাজার আসল পরিচয়। সেই নিশানে পদ্মফুল অর্থাৎ বিকাশের শতদলধারা। পদ্মফুলের ইশারায় একটা পেলব অনুভূতির স্পর্শ আমদের মনের আকাশে চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রাজার নরম মনের ছবিটি আমরা দেখে নিই। কিন্তু রাজার কঠোর রূপটি ধরা থাকে বজ্রের চিত্রকল্পে। রাজা চরিত্রের কোমলে কঠিনের সম্মিলিত রূপটি ফুটে ওঠে রাজনিশানে—

"রাজার বাহিরে পদ্মের কোমলতা ও সৌন্দর্য, আর ভিতরে বজ্রের বিবিক্ত কঠোরতা।"[৬২]

ঠাকুরদার দৃষ্টিভঙ্গিস্নাত এই অপরূপ রূপটি সুদর্শনার নজরে আসে নি। কিন্তু রাজার কাঠিন্যকে জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেদিন তিনি সামগ্রিকভাবে অনুভব করতে পেরেছেন সেদিনই অন্ধকারের রূপটিও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সুরঙ্গমা বা ঠাকুরদার মধ্যে রাজা সম্বন্ধে ইতিবাচক উপলব্ধি ধরা আছে—

> "সুরঙ্গমা। সে যেন এইরকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে-আমার কান্নায়, আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক, সেই কঠিনেরই জয় হোক।"[৬৩]

সুদর্শনা এবং সুরঙ্গমার মধ্যে অনেক অমিলের মধ্যেও এক জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দু'জনের চোখেই রাজা পাথর। কিন্তু দৃষ্টিকোণ এক এবং অভিন্ন নয়। সুদর্শনার চোখে পাথর চিত্রকল্প রাজা চরিত্রের নেতিবাচক দিকটিকে ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু সুরঙ্গমার চোখে ধরা পড়েছে রাজার ইতিবাচক দিক। সুরঙ্গমা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছে যে, পর্বতের মতো রাজা ধীরস্থির এবং একই সঙ্গে আশ্রয়স্থলও বটে। তাই সুদর্শনার মতো 'সমস্ত

বুক দিয়ে ঠেলছি- বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না।' —এ জাতীয় আক্ষেপ তার মধ্যে দেখা যায় না।

রাজা চরিত্রের এই বিশালত্ব ঠাকুরদার বক্তব্যেও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

"ঠাকুরদা।... প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।"[৬৪]

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২০৪

২. অশ্রুকুমার সিকদার : উদ্ধৃতি, রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য, আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১০, পৃ. ১৪৮

৩. অজিতকুমার চক্রবর্তী : কাব্যপরিক্রমা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃ. ৩৩

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উদ্ধৃতি, শঙ্খ ঘোষ : কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ১০২-১০৩

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৬৬৬

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৯

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৭২

৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৭৫

৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৮

১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৪

১১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৮

১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৯

১৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭০৮

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১২

১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১২

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১০

১৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৪

১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৪

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৪

২০. অজিতকুমার চক্রবর্তী : কাব্যপরিক্রমা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃ. ৪১-৪২

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৪৮, পৃ. ৬৪৮-৬৪৯

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৪৮

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৬৬৫

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৫

২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৫

২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৫

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৭

২৮. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাট্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, পাণ্ডুলিপি, প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪০৬, পৃ. ২০৯

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৬৮৬

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৪

৩১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৮

৩২. চৈতালি সাহা : রবীন্দ্রনাট্যে প্রতিমা, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১১৩

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৬৬৫

৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৩

৩৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৩

৩৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৪

৩৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৪

৩৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৫

৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৫

৪০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৫

৪১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৯

৪২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৯

৪৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৫

৪৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৫

৪৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৮-৬৬৯

৪৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭০৩

৪৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭০৫

৪৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭০৫

৪৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৫

৫০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৪

৫১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৪

৫২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৫

৫৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৪

৫৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৪

৫৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৮

৫৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৮

৫৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭০২

৫৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১২

৫৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৫

৬০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৫

৬১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৯৫

৬২. প্রমনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তৃতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃ. ১৪৭

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৬৯৯

৬৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৭৪

ডাকঘর

রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার মূর্ত ভাষায় রূপদান এবং তাকে আশ্রয় করে চেতনাঋদ্ধ প্রতিবাদ 'ডাকঘর' নাটকটিকে অবিস্মরণীয় এক বিস্ময়কর সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছে। বিরোধী পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার যে রাজনৈতিক প্রয়াস, যুগ-যুগান্তরব্যাপী শাসকের যে অস্বীকার প্রবণতা তারই এক 'অমল' প্রতিবাদ অন্যভাবে ধ্বনিত হয়েছে এ নাটকে। জীবাত্মা-পরমাত্মা, সীমা-অসীম—এ জাতীয় তত্ত্বে ডাকঘরকে বিশ্লেষণ করা জায়মান বিশ্বে একটা জবরদস্তি প্রায়াস মাত্র। বরং একটু অন্যভাবে যদি দেখি তাহলে এ নাটকে চিল-চিৎকারের – ভেঙে দেব, গুঁড়িয়ে দেব-র মতো উচ্চকিত প্রতিবাদ নয়, নীরব প্রতিবাদের যেন এক বিপ্লব ঘটে গেছে। অমল নামক এক কিশোরের চেতনায় সংঘটিত হয়েছে গ্লোবালাইজড বিশ্বে যূথবদ্ধতার স্বপ্নবীজ। ডাকঘর নাটককে তাই একজন অসুস্থ বালকের মৃত্যুলাভে মুক্তিলাভের কাহিনিমাত্র মনে করাটা এক ধরনের অতি সরলীকরণ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সরলীকরণ কিন্তু বারেবারেই ঘটেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাতে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছেন। শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন—

> "বস্তুত পুরো ডাকঘর নাটকটিই তাঁর নিজের মৃত্যুকল্পনা অবলম্বনেই লেখা। ১৩২২ সালে পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের সকলের কাছে তাঁর নাটকের বিষয়ে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন; ৪ঠা পৌষের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ডাকঘর'। সেই বক্তৃতাগুলি তখন আমার পিতৃদেব কালীমোহন ঘোষ তাঁর দিনলিপি-পুস্তকে লিখে রেখেছিলেন, এখানে তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—
>
> ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু-উৎসবের জন্য লিখি নি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম, প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল, চল, বাইরে চল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে, সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই-যাই এমন

একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। পূর্বে আমার দু'একটি বেদনা এসেছিল। আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন, তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম! মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ... আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমণীয়তা আছে। যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল-বহু দূরে সে অজানা রয়েছে, তার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে অজানার ডাক! দূর সেখানে মুগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমণীয়, বহু-বিস্তৃত অপরিচিতের মধ্যে সে আনন্দ। সেই যখন অন্তরালে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিলে, সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না, থাকব না, যাব, যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে, সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে-আর আমি কি না বসে রইলুম! এই দুঃখকে, ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে।"[১]

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার অসীম আগ্রহে কবিমনে জেগে ওঠা এই আবেগতরঙ্গের কথা তিনি অন্যত্রও প্রকাশ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট মনে হয়েছে যে প্রকৃতির বিকাশের পথ ধরেই তিনি বর্তমান প্রকাশক্ষম অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। অমল যেমন তার মানসনেত্রে শ্যামলী নদী, তার ধারে পাঁচমুড়া পাহাড়, পাহাড়ের কোলে অচেনা গ্রাম ইত্যাদি সবই দেখতে পায় এবং অনুভব করে রবীন্দ্রনাথও ঠিক তেমনই পৃথিবীর অজানা গাছপালা, লতাগুল্ম ইত্যাদির মধ্যে ঐক্য-আত্মীয়তার বন্ধন অর্ধচেতন মনে অনুভব করেছেন—

"এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তের দেশদেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেলগাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।"[২]

বাস্তববাদী মাধব দত্তের কষ্টার্জিত অর্থ ভোগ করার কেউ ছিল না। সেজন্য সে খুব চিন্তিত ছিল। সেই চিন্তার অবসান হয় তার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো অমলের আগমনে। কিন্তু অন্য এক চিন্তা এসে হাজির হয়। অমল অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরৎকালের রোদ ও বাতাস অমলের কাছে বিষবৎ—কবিরাজের এই পরামর্শে মাধব দত্ত অমলকে ঘরবন্দী করে ফেলে। অমল বাইরের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। অসহায় অমল জানালার পাশে বসে বাইরের দিকে তাকায়। সে দেখতে পায়-দূরের পাহাড়, ডুমুর গাছের তলা দিয়ে প্রবাহিত ঝরনা, নাগরাজুতো পরা পথিক বাঁশের লাঠি কাঁধে সেই ঝরনা পার হয়ে চলে যায়। অমলেরও পথিক হতে ইচ্ছে করে। জানালার পাশ দিয়ে সুর করে হাঁকতে হাঁকতে দইওয়ালা যায়। অমল তার সঙ্গে আলাপ জমায়। তারও দইওয়ালা হতে ইচ্ছে করে। দইওয়ালার সুরে অমল কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ে। রাজপ্রহরীর কাছ থেকে সে জানতে পারে যে, রাস্তার ওপারে বড়ো বাড়িতে রাজার ডাকঘর বসেছে। সেই রাজচিঠি অমলও একদিন পাবে। অমল সরলমনে তা বিশ্বাস করে। গাঁয়ের মোড়লকে অমল সে কথা অকপটে জানায়। অবিশ্বাসী মোড়ল অবজ্ঞা করে চলে যায়। শশী মালিনীর মেয়ে সুধার কাছ থেকে অমল ফুল চায় এবং সে যেন অমলকে ভুলে না যায় সেই মিনতিও জানিয়ে রাখে। ছেলেদের দলের সঙ্গে তার বাইরে গিয়ে খেলায় যোগ দিতে ইচ্ছে

করে। কিন্তু তার বাইরে বের হওয়া বারণ। সে বন্দী। তার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেলে জানালার পাশ থেকে সরে এসে তাকে সব সময় শুয়ে থাকতে হয়। ঠাকুরদার কাছ থেকে অমল জানতে পারে রাজা তাকে চিঠি পাঠিয়েছেন, সে চিঠি পথে আছে। মোড়ল একটি অক্ষরহীন সাদা পৃষ্ঠা দেখিয়ে অমলকে উপহাস করে। সেদিন সন্ধ্যায় রুদ্ধদরজা ভেঙে রাজদূত এসে রাজার আগমনের খবর দিয়ে বলেন যে, রাজা দ্বিপ্রহর রাতে আসবেন, তিনি অমলের চিকিৎসার জন্য রাজকবিরাজকে পাঠিয়েছেন। রাজকবিরাজ বন্ধ দরজা-জানালা সব খুলে দিলেন। প্রদীপের আলো নিভিয়ে দিলেন। অমলের দুচোখ জুড়ে ঘুম এলো। সুধা এসে দেখল অমল ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তখন রাজকবিরাজের হাতে ফুল দিয়ে বললো, অমল জেগে উঠলে যেন তার কানে সুধার এই কথাটি বলা হয়—

"রাজকবিরাজ। কী বলব?

সুধা। বোলো যে, 'সুধা তোমাকে ভোলে নি'।"[৩]

অমলচরিত্র সম্বন্ধে শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার উক্তি করে তাকে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অভিশাপগ্রস্ত যক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

> "ডাকঘরের অমল যেন মেঘদূত কাব্যের অভিশাপগ্রস্ত বিরহী যক্ষ। যক্ষের বিরহাবস্থার মধ্যে যে ধরনের বন্দীভাব, অমলের মধ্যেও সেই ভাব। আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখিয়া অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ তাহার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তাহারই উপর আরোপ করিয়া বিচিত্র নদী, পর্বত, গ্রাম, বন, নগরীর উপর দিয়া অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করিতে করিতে যেভাবে অলকা বা উজ্জয়িনীতে পৌঁছিয়াছে, বন্দী অমলও সেইভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে।"[৪]

অমল ডাকঘরের প্রধান চরিত্র। অন্যসব চরিত্র তার অনুষঙ্গেই নাটকে জায়গা পেয়েছে। অমল রবীন্দ্রনাথের শৈশবের ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা অনেকটাই রঞ্জিত। জীবনস্মৃতির 'ঘর ও বাহির' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যেন অমলেরই প্রতিরূপ। অমলের মতোই বন্দী রবীন্দ্রনাথ জানালা খুলে প্রায় সারাদিন জানালার নীচে ঘাট বাঁধানো পুকুরটাকে ছবির বইয়ের মতো দেখতেন।

এভাবেই তাঁর সময় পার হয়ে যেত। মানুষের নানা ধরনের স্নান সারা হয়ে গেলে নির্জন পুকুরের বটগাছের তলার অন্ধকার কবিমনে এক অজানা রহস্যলোকের সন্ধান দিত। জানালার নীচ থেকেই বালক রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধচোখে বাইরেটাকে দেখে নিতেন। প্রকৃতির রহস্য, খাঁচার পাখি-বনের পাখির দ্বন্দ্ব, চেনা গয়লানির গোয়ালঘর—তার দুধ নিয়ে আগমনের দৃশ্য, উদাস করা পসারির ডাকের সুর, শরতের ভোরবেলা—তার নবীন রোদে লেগে থাকা শিশিরের ঘ্রাণ, রাজবাড়ির খোঁজ—এ সবই অমলের কল্পনায় ডাকঘর নাটকে কমবেশি রূপান্তরিত হয়েছে। শৈশবের ঘরে বন্দী হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা, "জানলার খড়খড়ি খুলিয়া"[৫] জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতিজগত ও মানুষকে দেখার জন্য কবিমনের যে উৎসাহ তা অমলের সঙ্গে তাঁকে যেন কোথাও এক করে দিয়েছে—

> "বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকুর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ-মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"[৬]

'জানালা' বালক রবীন্দ্রনাথ ও বালক অমল, উভয়ের জীবনেই সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই 'জানালা' ও 'দরজা' ডাকঘর নাটকের অতি গুরুত্বপূর্ণ দুই উপাদান। নাটকের চিত্রকল্পের আলোচনায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। 'জীবনস্মৃতি'র ঘরবন্দী জীবন, কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা, শান্তিনিকেতনে পরীক্ষামূলকভাবে ডাকঘর বসানোর প্রয়াস ইত্যাদির প্রভাব ডাকঘর নাটকে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের বালকবয়সে ভৃত্য শ্যামের অধীনে থাকার অভিজ্ঞতাও শিল্পের রূপ নিয়ে নাটকে এক ভিন্ন পরিসর রচনা করেছে—

"বাহিরবাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।"[৭]

বড়ো হয়েও সেই অভিজ্ঞতার গণ্ডি মুছে গিয়েও মোছে নি—

"আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই।"[৮]

সেজন্য অমলের অসুস্থতার বিষয়টাকে দৈহিক নয়, মানসিক দিক দিয়ে বিচার করতে হবে। নাটকে অমলের মৃত্যু হয়েছে বলে নিঃসংশয় হওয়া চলবে না। অনেকের মধ্যে এই নিয়ে খানিকটা সংশয় যে নেই তা নয়। সেজন্য সংশয় নিঃসংশয়ের দ্বন্দ্ব থেকে বের হয়ে আসতে গেলে প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে অমলের অসুস্থতা প্রকৃতপক্ষে মানসিক, দৈহিক নয় মোটেই। তখনই স্পষ্ট হবে যে ওটা মৃত্যু নয়, জীবনে উত্তরণ।

আসলে 'ডাকঘর' নাটকটির মূল কথাটি হলো, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের প্রতিবাদ। এতদিন যেভাবে ভাবা হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। অমল যে জীবন যাপন করছে প্রকৃতপক্ষে তা মৃত্যুর সামিল। এবার সে মৃত্যুকে মাড়িয়ে যেখানে যাচ্ছে সেটাই জীবন। যদিও বাংলা সমালোচনা সাহিত্য থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় দিয়েই মোটামুটিভাবে এ যাবৎ ডাকঘরের ডাকবাক্স ভরিয়ে তুলেছে। কয়েকটি উদাহরণ—

১. "নাটিকার পরিণামটা আমার স্পষ্টতই মৃত্যু বলিয়া মনে হয়।"[৯]

২. "নাটকের শেষে অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার এই ঘুমের তাৎপর্য রহিয়াছে। ঘুম এখানে মৃত্যুর প্রতীক বলিয়াই বোধ হয়।"[১০]

৩. "রবীন্দ্রনাথের এই একটি নাটকই মৃত্যুকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাও যার-তার মৃত্যু নয়। একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে বড়ো জোর, মৃত্যুর একেবারে বিপরীত প্রান্তে, জীবনের প্রভাত সময়ে সম্ভাবনার উজ্জ্বল রোদে পরিস্নাত হয়ে যার থাকবার কথা। তারই ক্ষয়, অবসন্নতা ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এই নাটক। উপরে উপরে প্রতীক-রূপকের যে সাজই পরান না কেন নাট্যকার, এ-নাটক যে মৃত্যুর সে সম্বন্ধে পাঠক বা দর্শকের কোনও সংশয় থাকে বলে মনে হয় না।"[১১]

কিন্তু 'সংশয়' সংশয়াতীত। কেননা কাল্পনিকতার ধোঁয়াশা থেকে বের হয়ে এসে আবেগকে যতটা সম্ভব সংগুপ্ত রেখে বিশ্ববন্দিত এই রচনাটিকে চিনতে চেষ্টা করলে দেখা যাবে অমলের অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের এক নীরব প্রতিবাদকে শিল্পিতরূপ দিয়েছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন অমল তথাকথিত ঘুমের জগতে ঢলে পড়ছে তখন সেখানে সবাই উপস্থিত-বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী নির্বিশেষে। কেউই সেখানে ব্রাত্য নয়। আসলে এটাই জীবনের সত্যধর্ম। এই সম্পৃক্ততা চরাচরে সর্বত্রই বিরাজমান। এ নাটক কোনো অর্থেই মৃত্যুর নাটক নয়, মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাটক। সাধন চট্টোপাধ্যায় চমৎকার বলেছেন—

"'ডাকঘর' নাটকের স্পেস পরাধীনতার মুহূর্তে ফরাসী জাতির উদ্বোধনে যেমন শক্তি যোগায়, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম বিতর্কেও একটা মনগড়া, ছোট মাপের, অর্থ খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করে। আসলে, চেতনায় সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব চলছেই, আমরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, আধুনিকতা ও সভ্যতার নামে যে-খণ্ডায়নবৃত্তি শুরু করেছি, তারই বিষময়তা আমাদের প্রাণশক্তিকে নীরবে শুকিয়ে মারছে। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বিশ্বসংসারে প্রকৃতির শক্তির মধ্যেই ইতি ও নেতি বা 'negative-positive'-এর বিরোধলীলা চলছে। মানব সংসারেও প্রতিদিন দুই শক্তির ছায়াপাত ঘটতে দেখি। কী ব্যক্তি মানুষ, কী সমষ্টি মানুষ—ইলেকট্রন প্রোটনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মতো, দুই বিপরীত শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া স্থিতাবস্থা বা সামঞ্জস্য রক্ষা

করে চলেছে। খণ্ডন হচ্ছে এমন নির্বাচন, যা থেকে বিশেষ, বিশেষকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলে, নইলে খণ্ডিত করা যায় না। আমরা নেতিকে বাদ দিয়েই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-আমাদের ঈপ্সিত অবস্থান তৈরি করে নিতে চাই।"[১২]

এর পরেই তিনি ডাকঘর নাটকের গভীরে প্রবেশ করে ভিন্নতর ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ বলছেন কোনো কিছুকেই এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে যেতে হবে। তাই 'ডাকঘর'-য়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ আমাদের বার বার স্মরণ করতে হবে। শেষদৃশ্যে রাজকবিরাজ ঘরে প্রবেশ করে যখন বলছেন

'এ কী। চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ। খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও। —(অমলের গায়ে হাত দিয়ে) বাবা, কেমন বোধ করছ?'

তখন 'দ্বার', 'জানালা' এবং 'খুলে দেওয়া' বৃহৎ একটি মাত্রা লাভ করছে। সীমা যেন অসীমের পানে ধাইতে চাইছে। খানিক পরই নাট্যমুহূর্তগুলো যখন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে দর্শকের চেতনায় বিশাল একটি দেশ-কাল সৃষ্টির লগ্ন তৈরি করছে রাজকবিরাজ বলছেন যখন

'তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। (মাধবের প্রতি) এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্যে পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখো। (মোড়লকে নির্দেশ করিয়া) ঐ লোকটিকে তো এ-ঘরে রাখা চলবে না'

অমল আপত্তি তুলল। 'না, না, কবিরাজ মশায় উনি আমার বন্ধু। তোমরা যখন আস নি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন।' এমনকি মঞ্চে শেষদৃশ্যের, কেউই বাদ পড়ে নি। ঠাকুরদা 'চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা কোয়ো না।' বলে তিরস্কার করলেও মাধব দত্তকে ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আদেশ দেন নি। বিশ্বসংসারে এই 'যোগ'-ই পূর্ণতার পথে আমাদের নিয়ে চলে। খণ্ডতা নয়। এটাই বড়ো বাস্তব ডাকঘর নাটকে।"[১৩]

সুতরাং অমলের মৃত্যু নিয়ে সমালোচকদের নিশ্চিন্ত বা সংশয়িত হওয়াটা খণ্ডিত করে দেখার প্রয়াসমাত্র। অমল তার যাপিত মৃত্যুজীবন থেকে অমৃতজীবনে গিয়ে পৌঁছেছে। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য—

> "নাটকে অমলের ঘুমিয়ে পড়া নিয়ে এক ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পরবর্তীকালে স্পষ্ট জানিয়েছেন, অমল মরে নি।"[১৪]

অমলের চেতনায় জীবনের নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। ডাকঘরের আলোচনায় এটা মনে রাখা খুব জরুরি। তাছাড়া সৃষ্টি যে স্রষ্টাকেও ছাড়িয়ে যায় তার খুব বড়ো উদাহরণ ডাকঘর:

মাধব দত্ত ও অমলের কথোপকথন—

"মাধব দত্ত। কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল। কবিরাজ কেমন করে জানলে?

মাধব দত্ত। বল কী অমল! কবিরাজ জানবে না! সে যে এত বড়ো বড়ো পুঁথি পড়ে ফেলেছে!

অমল। পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?

মাধব দত্ত। বেশ! তাও বুঝি জান না!

অমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়ি নি-তাই জানি নে।

মাধব দত্ত। দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো—তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল। বেরোয় না?

মাধব দত্ত। না, কখন বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে—আর কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে—বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অমল। না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না-পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না।"[১৫]

দইওআলা ও অমলের কথোপকথন—

"দইওআলা। মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা। এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল। না, না, আমি ককখনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব।"[১৬]

মাধব দত্ত বা দইওআলা দুজনের সঙ্গে কথোপকথনে অমল বারেবারেই 'পণ্ডিত' হতে অস্বীকার করেছে। এই অস্বীকারের মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করেছে। 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না-পিসেমশায়,' থেকে 'না, না, আমি ককখনো পণ্ডিত হব না'। —একটা সংকল্প যেন প্রতিবাদরূপে ফুটে উঠেছে। পণ্ডিতির বিরুদ্ধে অমলের জেহাদ রবীন্দ্র-মস্তিষ্কের এক নিপুণ কৌশল। সহজ সুরের আকর্ষণকে বাদ দিয়ে নীরস পুঁথি-চর্চা যে রবীন্দ্রসমর্থন রহিত তা আমাদের অজানা নয়। নীরস এক জীবনচর্যায় অমল মৃত প্রায়। অমলের তত্ত্বাবধায়করূপী মাধব দত্তের নামের মধ্যে চমৎকার এক রূপকত্ব প্রচ্ছন্ন! মাধব = পৃথিবী; দত্ত = দান। অর্থাৎ পার্থিব পৃথিবীর সংসারী লোক। তার হাতেই কিনা 'অমল'-এর ভার! 'সুধা' ইত্যাদি চরিত্রের নামগুলিতেও রবীন্দ্রনাথ নীরব প্রতিবাদকে এমনভাবে চারিয়ে দিয়েছেন যার মধ্যে জীবনের কত না বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে!

মাধবের অভিভাবকত্ব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপাকে পড়ে "আকাশ-বিলাসী বিহঙ্গশিশু"[১৭] অমলের সামনে যে রূঢ় পৃথিবী এসে হাজির হয়েছিল—যার দরুন অমলকে যে-জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা হচ্ছিলো তা আসলে মৃত জীবনেরই ভিন্ন রূপ। তারই প্রতিবাদে রচিত এ নাটক। তাই অমলের 'ঘুমিয়ে পড়া' বা 'মরে যাওয়া' বলে যা এতকাল বলা হয়েছিল তা নতুন জিজ্ঞাসার ভুবনায়িত আলোয় মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া বই আর কিছুই নয়।

দুই

ডাকঘর নাটকের কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প জানলা এবং দরজা। এই চিত্রকল্প দুটি বস্তুজগতের বন্ধন ছিন্ন করে অমল চরিত্রের ভাবচেতনার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। অমলের মতো এরাও অনেকটা যেন মৃত্যু থেকে জীবনের সড়ক অন্বেষণ করছে—

> "অমল। আমাদের জানলার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায় – আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।"[১৮]

জানলার এই চিত্রকল্পে ঘরবন্দী অমলের ব্যাকুলতা, তার চলার আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। কিন্তু জানলা দিয়ে দৃশ্যমান পাহাড়ের চিত্রকল্পটি মাধবের কাছে অমলকে আটকে রাখার হাতিয়ারে রূপান্তরিত—

> "মাধব দত্ত। কী পাগলের মতো কথা! কাজ নেই কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই! কী যে বলে তার ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ—নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এত বড়ো একটা কাণ্ড করার দরকার কী ছিল!"[১৯]

দু'জনের এই কথোপকথনের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যেকার স্পষ্ট পার্থক্য চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। অমল উচ্চগ্রামের তারে বাঁধা এক কল্পনাপ্রবণ কিশোর। মাধব দত্ত দৈনন্দিন জীবনের অতি চেনা এক রূঢ় বাস্তববাদী চরিত্র। একজন আকাশের ওপারের আর এক পৃথিবীর স্বপ্নে মগ্ন। মুগ্ধ। অন্যজনের মন বস্তুবাদী। তাই সে প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। সমস্যা হলো—

মাধবের মতো চরিত্রই দুনিয়াটাকে চালাতে চায়। সাধারণত এরাই প্রভুত্ব করে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই অমলের প্রতি নিমজ্জিত ও নির্দিষ্ট। এর অনেক নজির ডাকঘর নাটকে আছে।

বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য দরজা খুলে ফেলা বা ভেঙে ফেলার মতো চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথের কাছে অন্যতম পছন্দের চিত্রকল্প। কবিরাজ আর রাজকবিরাজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় দরজার চিত্রকল্পের অসামান্য প্রয়োগ ডাকঘর নাটককে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে—

> "কবিরাজ। হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে—আমি দেখে এলুম, তোমাদের সদর দজার ভিতর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও-দরজাটা বেশ ভালো করে তালাচাবি-বন্ধ করে দাও। না-হয় দিন দুই-তিন তোমাদের এখানে লোক-আনাগোনা বন্ধই থাক-না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি-দরজা আছে। ঐ-যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়।"[২০]

কবিরাজের ঠিক বিপরীতে রাজকবিরাজের অবস্থান। চিত্রকল্পের প্রয়োগ নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ দুজনের মধ্যে চমৎকার contrast গড়ে তুলেছেন—

> "রাজকবিরাজ। একি! চারি দিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও।—"[২১]

দু'ধরনের কবিরাজ অমলের চিকিৎসার জন্য দু'রকমের পথ বাতলেছেন। পুঁথিসর্বস্ব কবিরাজ নিশ্চিত ভাবেই একজন সাধারণ মানের হাতুড়ে, অন্তত নাটকে তাঁর চিকিৎসাপন্থা সে দিকেই ইঙ্গিত করছে। সেজন্য তিনি কেবল সাধারণ অসুখেরই নিদান জানেন—

> "....এখনই ভালো করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি বাড়ি গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি—"[২২]

কবিরাজ অমলের সত্যিকারের অসুখকে শনাক্ত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বুঝতেই পারেন নি যে অমলের অসুখ আপাতভাবে শারীরিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। অমল যে খুবই অনুভূতি প্রবণ একজন কল্পনাজগতের কিশোর-জীবনের রূঢ়তায় যে মৃতবৎ—কবিরাজ তাকেই কিনা বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন—

"কবিরাজ। ...ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না। ... এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ—"[২৩]

কবিরাজের নির্দেশনামা অমলের কাছে দাসত্বের অধিক।

রাজকবিরাজ অমলের সমস্যাকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছেন। তাই তাঁর নির্দেশ কবিরাজের বিপরীতে গিয়ে ধ্বনিত হয়েছে—'খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও।—' যার ফলে অমলও দ্রুত সাড়া দিয়েছে—

"অমল। আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আ:, সব খুলে দিয়েছে—"[২৪]

এখানে একাধারে 'আ:' অব্যয়টির এবং শ্রুতিচিত্রকল্পটির মোক্ষম প্রয়োগ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বন্ধনহীন আনন্দঘন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন তার আলোয় আমাদের চেতনালোক বারেবারেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অমলের মানসনেত্রে চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে। দইওআলার সঙ্গে, সুধার সঙ্গে বা ঠাকুরদার সঙ্গে কথোপকথনে সেইসব চিত্রকল্পের প্রকাশ ঘটেছে। অমল দইওআলার গ্রামে না গেলেও সেই গ্রামের স্পষ্ট ছবি তার মনের চোখে ধরা দিয়েছে—

"অমল। ... অনেক পুরোনো কালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম-একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। .... সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে। ... মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়-তাদের লাল শাড়ি পরা।"[২৫]

সুধাকে সে বলে—

"...আমার মনে হয় আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হলে আমি চলে যেতে পারি খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব-আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুটতে পারি।..."[২৬]

ঠাকুরদাকে সে বলে—

"... আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলই আসছে—তার পরে আখের খেত—সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাতদিন একলাটি চলে আসছে; খেতের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদা-খোঁচা লেজ দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি।..."[২৭]

অমলের কল্পনা ও চেতনার গহীন তলদেশ থেকে এইসব বাচনিক-মানসনেত্র রঞ্জিত চিত্রকল্পগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। তার বাচনভঙ্গি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তার এ দেখা কেবল চর্মচক্ষুর দেখা নয়, এ দেখা অমলের অন্তেন্দ্রিয়ের দেখা। সে কারণে বলা যায় যে দৃষ্টি এখানে দর্শনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বিশেষত ঠাকুরদার সঙ্গে কথোপকথনে পথের যে চিত্রকল্পটি ফুটে উঠেছে তাতে এক সৌন্দর্যময় কল্পলোকের ছবি ধরা পড়েছে। পথের এই ছবিটি একাধারে প্রকৃতি ও মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে নির্মিত। সেজন্য এই পথের আধারে পাহাড় আছে, আছে নদী। আবার একই সঙ্গে মানুষের হাতে গড়া জোয়ার ও আখের খেত আছে। খেতের আলবাঁধা পথ আছে। এখানে দৃশ্যকল্প রচনায় শুধু যে অমলের ইন্দ্রিয় সংবেদনার প্রকাশ ঘটেছে তা নয়, বরং তার অতীন্দ্রিয় চেতনার দ্যোতনাও ফুটে উঠেছে। ফলে

অমলের বাচনিকে যে দৃশ্যকাব্য রচিত হয়েছে তা পাঠক-দর্শককে চৈতন্যময় ভাবলোকে উত্তীর্ণ করেছে।

রাজার কাছ থেকে আসা সাদাপৃষ্ঠার চিত্রকল্পটি অমলের মুক্তির আশ্রয়। এই সাদাপৃষ্ঠাকে সে নিজের মর্জিমাফিক ভরাবে। মজার ব্যাপার হলো ডাকঘর নাটকে ব্যবহৃত সমস্ত চিত্রকল্পই শেষ পর্যন্ত সাদাপৃষ্ঠার চিত্রকল্পে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নাটকটি খুবই প্রতীকীনির্ভর। রাজার চিঠিকেও সেই বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নাটকে তারার চিত্রকল্পে ইন্দ্রিয়াতীতের সূক্ষ্ম চেতনা এবং অনন্ত অসীমের ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে। সকাল বেলার ধ্রুবতারা সুধা ও অমলের সম্পর্কের দিকটিকে খানিকটা অস্পষ্টতায় এবং আভাসে তুলে ধরেছে—

"বালিকা। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকাল বেলাকার তারা—"[২৮]

এই চিত্রকল্পে কৈশোরক প্রেমের একটা পরোক্ষ ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ভোর যেমন দিনের সূচনা ঠিক তেমনই ভোর বা সকালের এই ধ্রুবতারা অমল ও সুধার সম্পর্কের প্রারম্ভিকা যেন।

রাজার আগমনের খবর আমল জানতে পেরেছে। এই অতি কাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ সে পেয়েছে ঠাকুরদার কাছ থেকে—

"অমল। ... সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি নে?"[২৯]

এখানে প্রতীক্ষারত অমলের ছবিটি সন্ধ্যাতারা দেখার আকুতিতে ধরা পড়েছে। রাজ-মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সন্ধ্যাতারার চিত্রকল্পে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

জীবনে চলার পথে অন্ধকার এক চির প্রতিবন্ধকতা। অমলের ইচ্ছাপূরণের পথের কাঁটা। কিন্তু একবার সেই অন্ধকার পেরিয়ে যেতে পারলেই খুঁজে পাওয়া যায় জীবনের পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ—

"অমল। ... সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি-অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।"[৩০]

এখানে তারার চিত্রকল্পে একটা অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা ধরা দিয়েছে। অন্ধকার একটা সীমামাত্র এবং তা সাময়িক। অন্ধকারের ওপারে আছে অপার অসীমের দ্যোতনা। সেই দ্যোতনাকে রূপ দেওয়ার জন্যই এখানে তারা চিত্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে।

জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যে ধ্রুবসত্যকে খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অমলের সংলাপে ফুটে উঠেছে—

"অমল। ...আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও।..."[৩১]

অমলের মনে একটা যেন সংশয়-সে ধ্রুবতারা হয়তো অনেকবার দেখেছে কিন্তু ঠিকঠাক ঠাহর করে উঠতে পারছে না—সেজন্য এই সুযোগে সে সঠিকভাবে রাজার কাছ থেকে ধ্রুবতারাকে চিনে নিতে চায়। কিন্তু রাজার কাছ থেকে কেন? আসলে রাজা এ নাটকে ক্ষমতার আধার নন। তিনি এখানে মুক্তিদাতা। আমলের মধ্যে তাই বন্ধনহীন জীবন তথা মৃত্যুকে অতিক্রম করার একান্ত বাসনা ধ্রুবতারা চিত্রকল্পে রূপ পেয়েছে।

প্রদীপের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। দেওয়াল না তুলে ঘরের সৃষ্টি হয় না। সেই দেওয়াল তোলা সীমাবদ্ধ ঘরের বাসনা প্রদীপের আলোর মধ্যে ধরা পড়েছে—

"রাজকবিরাজ। ... প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও-এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক,..."[৩২]

প্রদীপের মাধ্যমে তাই দৈনন্দিন সাংসারিক বন্ধনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু জীবন তো বিকশিত এবং প্রসারিত হতে চায়। সেজন্য ভেঙে ফেলতে হয় শারীরিক ও মানসিক সব দেওয়াল। দেওয়াল ভাঙলেই পৃথিবী। সেই পৃথিবীর অথবা অনন্ত অসীমের সীমাহীন ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলতেই রাজকবিরাজের মাধ্যমে সুকৌশলে রবীন্দ্রনাথ প্রদীপ আর তারার তুলনামূলক চিত্রকল্প সাজিয়ে নাটকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বকে উসকে দিয়েছেন।

অমলের জীবন তারার আলোকে উদ্ভাসিত। মাধব দত্তের কাছে প্রদীপের আলোই যথেষ্ট। সীমার মধ্যে সন্তুষ্ট তার বস্তুবাদী মন। সেজন্য সে প্রদীপের আলো নিভে গিয়ে ঘর অন্ধকারের আশংকায় একপ্রকার দিশেহারা—

> "মাধব দত্ত। ...এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন! তারার আলোতে আমার কী হবে!"[৩৩]

মাধব দত্তের এই আচরণ খুব স্বাভাবিক। কারণ তার মধ্যে অসীমের তাৎপর্য বোঝার কোনো ক্ষমতাই অবশিষ্ট নেই।

তথ্যসূত্র :

১. শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ২০৮-২০৯

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ ,পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১১, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৭৩৫

৪. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭২, পৃ. ১০৬

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৬০৪

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬০৪-৬০৫

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬০৪

৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬০৫

৯. অজিতকুমার চক্রবর্তী : কাব্যপরিক্রমা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃ. ৬৩

১০. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭২, পৃ. ১১১

১১. পবিত্র সরকার : ‘ডাকঘর’ : নাস্তিকের নিবিড় পাঠ, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০২, পৃ. ৯৬

১২. সাধন চট্টোপাধ্যায় : নাটক 'ডাকঘর' : মূল সুরের খোঁজে, বলাকা, বিশেষ সংখ্যা : নাট্যব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক ধনঞ্জয় ঘোষাল, নভেম্বর ২০১০, পৃ. ২২৩

১৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৩-২২৪

১৪. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের ছোটোদের নাটক, বলাকা, বিশেষ সংখ্যা : নাট্যব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক ধনঞ্জয় ঘোষাল, নভেম্বর ২০১০, পৃ. ১৭২

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৭২০-৭২১

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭২৩

১৭. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, মে ২০০৪, পৃ. ২২০

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৭২১

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭২১

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩২

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩৪

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩৩

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭১৯

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩৪

২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭২২-৭২৩

২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭২৬

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩০-৭৩১

২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭২৬

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩৪

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩৪

৩১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩৪

৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩৫

৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৩৫

অচলায়তন

'ডাকঘর'-এ ছিল নীরব প্রতিবাদ। কিন্তু 'অচলায়তন' সরব প্রতিবাদের নাটক। অচলায়তনে আচারমূঢ় এক সমাজব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ছবি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সমাজব্যবস্থা মূল্যহীন। মৃত-স্থবির এই সমাজব্যবস্থার বিপরীতে গতিশীল-জীবন্ত সমাজের বাণী রবীন্দ্রনাথের কলমে রূপ লাভ করেছে। অচলায়তন সর্বার্থেই অচল। সনাতন ধর্মের নামে অচলায়তন প্রকৃতপক্ষে একটা পুঞ্জীভূত সংস্কারের পিণ্ড। অচলায়তনের নির্মিত ছবিটি সব রকমের প্রতিবন্ধকতার প্রতিচ্ছবি। সেখানে পাথরের প্রাচীর, বন্ধ দরজা, নানা রেখার গণ্ডি, স্তূপাকার পুঁথি আর অহোরাত্র মন্ত্র পাঠের গুঞ্জনধ্বনি। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এর কোনো সংস্রব নেই। অচলায়তনের উত্তরদিকে রয়েছে একজটা দেবীর মন্দির। সেদিকে তাকানো বারণ। সেদিকের জানালা বহুকাল ধরে বন্ধ আছে। আবাসিকরা জানে সেদিকের হাওয়া ভীষণ ক্ষতিকর। তারা আটান্ন প্রকার আচমন ও বিশ-পঁচিশ হাজার প্রায়শ্চিত্ত বিধি মেনে চলে। নানা প্রকার ব্রতপালনে তারা অভ্যস্ত। তারা মন্ত্রলিখিত তাগা-তাবিজ শরীরে ধারণ করে। তাদের জীবনে যাদু ও মন্ত্রের বিশেষ প্রভাব। মন্ত্রের ভেতরে তাদের অন্তরাত্মা একান্ত নিমজ্জিত। অচলায়তনের হাজারো শাস্ত্রীয় মন্ত্রের ঘেরাটোপে তারা কার্যত সেঁধিয়ে আছে—

> "পঞ্চক। অচলায়তনের মধ্যে ঐ-যে আমরা দরজা বন্ধ করে আছি, দিব্যি আছি। ওখানে আমাদের সমস্ত বোঝাপড়া একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার মানুষ সেইজন্যে বড়ো নিশ্চিন্ত। কিছুতে কারও একটু সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারও মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ঐ-যে, চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেওয়ালে তিনবার সাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে দিয়ে আওড়াতে হয় "হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতের হু ফট স্বাহা" এর কারণটা কী—তা হলে কেবলমাত্র চারটে সুপুরি আর এক মাষা সোনা হাতে করে যাও তখনই মহাপঞ্চকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মানো, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই। তাই সমস্ত চমৎকার সহজ হয়ে গেছে।"[১]

সেই ছবিই যেন ধরা আছে বলাকা কাব্যের 'সবুজের অভিযান' কবিতায়—

"খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;

আর তো কিছুই নড়ে না রে

ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।

ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,

চক্ষু-কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,

ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা,

অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।"[২]

অচলায়তন একটি খাঁচা। মহাপঞ্চকের দল অচলায়তনকে খাঁচায় পরিণত করেছে। এই খাঁচাবন্দী জীবনের অনুভূতি পঞ্চক দাদাঠাকুরকে জানায়—

> "পঞ্চক। খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সব চেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুর্ দুর্ করে, ভাবে, 'বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে'। আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখি নি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।"[৩]

এই খাঁচার বিরুদ্ধে পঞ্চকের বিদ্রোহ। তাই সে গুরুর শরণাপন্ন হয়। সে জানে গুরু বিনে গতি নেই।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বালক সুভদ্র উত্তরদিকের জানালা খুলে দিয়ে ৩৪৫ বছরের অর্গল ভেঙে দিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আচার্য ও মহাপঞ্চকের মধ্যে সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক বিরোধ দেখা দেয়। মহাপঞ্চকের দল সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্তের নিদান দিলে স্নেহপ্রবণ আচার্য প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেন—"সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না"[৪] —বলে অসহায় সুভদ্রের পক্ষে তিনি রুখে দাঁড়ান এবং সুভদ্রকে অভয় প্রদান করেন—

"বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই।"[৫]

মহাপঞ্চকের চক্রান্তে দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত হতে হলেও আচার্য আত্মসমর্পণ করেন নি। তিনি অচলায়তনের স্থবির জীবনের প্রতি আসক্ত নন। উপাচার্য প্রথমে আচার্যের বিরোধিতা করলেও পরে তাঁকেই সমর্থন করেন। মহাপঞ্চক তাঁকে আচার্য হওয়ার লোভ দেখালে তিনি বলেন—

"মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ কথা বলবার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তর দিকের জানলা খোলার চেয়ে কম পাপ!"[৬]

আচার্য অদীনপুণ্যের নিজহাতে গড়ে তোলা জ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান কালক্রমে অচলায়তনে পরিণত হয়েছে। তিনি নিজেই এই কারাগার থেকে মুক্তি চাইছেন। পঞ্চকের মধ্যে আচার্য মুক্তিকে দেখতে পান—

"তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য।"[৭]

শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

"জড় নিয়মের অনুশীলন করিয়া, সংস্কার প্রথার প্রাণহীন বাঁধনে আবদ্ধ থাকিয়া, কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা প্রাণকে নিপীড়িত করিয়া অচলায়তনের অধিবাসীরা ধর্মপালন করিতেছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। পুঁথি আর মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা তাহারা প্রাণের চঞ্চলতা ও স্বাধীনতাকে দমন করিতে চাহিয়াছিল—একজটা দেবীর বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির সহিত মিলনের, বিশ্বের সহিত যোগের সকল দুয়ার তাহারা রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে প্রাণের প্রতিমূর্তি, মূর্তিমান বিদ্রোহরূপে দেখা দিল পঞ্চক। সে শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থহীন আচারের দেশে প্রথা ও

কুসংস্কারকে খণ্ডন করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। নিয়মের মধ্যে অনিয়মের সূচনা করিয়া অচলায়তনের বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রাপ্রবাহের মধ্যে বৈচিত্র্য ও প্রাণের সাড়া আনিয়াছে। পঞ্চক যেন একটি জীবন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।"[৮]

পঞ্চক অচলায়তনের বিস্ময়। ভীত-সন্ত্রস্ত সুভদ্রের পাশে থেকে সে তাকে সাহস যুগিয়েছে। সুভদ্রের শান্তি মকুবের জন্য সে চেষ্টা করেছে। পঞ্চক এক নির্ভীক চরিত্র। সে অচলায়তনের বস্তাপচা নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে না। পঞ্চকের মধ্যে প্রাণের সজীব-লীলা। সে যেন 'সবুজের অভিযান' কবিতার সবুজ-অবুঝ দলের প্রতিনিধি। সে খুব সহজেই শোনপাংশু বা দর্ভকদের দলে মিশে যেতে পারে। তাদেরকে অশুচি বা অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না। অচলায়তনের অনুশাসন তাকে বাঁধতে পারে না। সে নিজেকে মন্ত্রতন্ত্রের জালে জড়িয়ে ফেলে নি। শোনপাংশুর দল দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে অচলায়তন ভেঙে ফেলতে চাইলে সেও তাদের সঙ্গে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই দাদাঠাকুর বা গুরু জ্ঞান-প্রেম-কর্ম-আনন্দ-রসের সার্বিক সমন্বয়ের প্রতিনিধি। লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আদর্শহীন অচলায়তনের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। তাই তিনি আচার্যকে বলেছেন—

"যে-চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।"[৯]

পঞ্চককে উদ্দেশ্য করে তিনি তাঁর অভয়মন্ত্র দিয়ে বলেছেন—

"ভয় নেই পঞ্চক। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।"[১০]

আচারসর্বস্বতার দাসত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে গুরু-দাদাঠাকুর অচলায়তনে মুক্তপ্রাণের নির্ঝরিণী বইয়ে দিয়েছেন। তিনি যেমন সংকীর্ণতার প্রাচীর ভাঙতে জানেন ঠিক তেমনই উদার-মহৎকে গড়তেও জানেন। সে কাজে তিনি মহাপঞ্চক এবং পঞ্চকের পাশাপাশি তাদের অফুরন্ত

কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগাতে শোনপাংশুদেরও আহবান জানান। আসলে তিনি একজন সক্রিয় প্রতিবাদী যিনি ভাঙেন আবার গড়েনও। মানস মজুমদারের অভিমত—

> "'সবুজের অভিযান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আহ্বান: 'আনরে টেনে বাঁধা-পথের শেষে'। পঞ্চক বাঁধা-পথকে অমান্য করেছে। এজন্যে তাকে কম উপহাস সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু তার প্রতিবাদের স্পৃহা তাতে লুপ্ত হয় নি। বাঁধা-পথ অপছন্দ বলেই গুরু শোনপাংশুদের মাঝখানটিতে দাদাঠাকুরের জীবন বেছে নেন; দর্ভকপল্লীতে গোঁসাই সাজেন। বাঁধা-পথের বাইরে যে জীবন, সে জীবনের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ। উভয়েই প্রতিবাদী। প্রতিবাদ অচলায়তনের বিরুদ্ধে। আর সে প্রতিবাদ সফল।"[১১]

নাটকে মন্ত্রের সঙ্গে গানের দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রের বিরুদ্ধে গানকে এ নাটকে গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যবহার করে নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করেছেন। মহাপঞ্চকের মন্ত্রের প্রতি চরম আসক্তি। নাটকের শুরুতেই পঞ্চকের গান—

"তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে

কেউ তা জানে না,..."[১২]

সেই গান শুনে—

"মহাপঞ্চক। গান! আবার গান!

পঞ্চক। দাদা, তুমি তো দেখলে—তোমাদের এখানকার মন্ত্র-তন্ত্র আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক। সে তো দেখতে বাকি নেই—কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পঞ্চক। একমাত্র ঐটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক। পারি! ভারি অহংকার। গান তো পাখিও গাইতে পারে।"[১৩]

গানের প্রতি মহাপঞ্চক একান্তই বিমুখ। কিন্তু তাঁর মনে আশঙ্কা। পঞ্চকের গানে মন্ত্রের বাঁধন ছিন্ন করার শক্তি তিনি খানিকটা যেন টের পান। মন্ত্র এ নাটকে বন্ধনের আর গান সেই বন্ধনমুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছে। গান অচলায়তনের বাইরের জগতের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছে :

"দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের মন্ত্র নেই বলে আমরা শুধু কেবল গান গাই।"[১৪]

পঞ্চক-দাদাঠাকুর সবার গানে নীরস মন্ত্র পাঠের বা নিষেধের তর্জনীর বিপরীতে মুক্তির আনন্দধ্বনি বেজে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব সম্বন্ধে যশস্বী কথাকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাই মন্তব্য করেছেন—

"স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে পাশ্চাত্যের ব্যান্ড মিউজিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা বেড়েছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ... রবীন্দ্রনাথের গানের প্রধান আবেদন ব্যক্তির কাছে। ... এই ব্যক্তির একান্ত অনুভব সবচেয়ে বেশি সাড়া পায় রবীন্দ্রসংগীতে। তাই এই পঙ্গু বা রুগ্ন ব্যক্তিটিকে বার বার যেতে হয় তাঁর গানের কাছেই।

রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যে-ব্যক্তিকে তিনি শক্ত সমর্থ মানুষ। আমাদের পঙ্গু ব্যক্তি রবীন্দ্রসংগীতে নিজেকে শনাক্ত করতে চায় শক্ত মানুষ হিসেবে। ... ব্যক্তিত্ববান মানুষ দায়িত্বশীল, সে কেবল নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকতে পারে না। তাই তার চারদিকের মানুষের প্রতি সে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ওঠে।..."[১৫]

এরপরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের অন্তর্নিহিত শক্তির মোক্ষম কথাটি ব্যক্ত করেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের গান মানুষকে বিপ্লবের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে না। কিন্তু শক্ত সমর্থ ব্যক্তি গঠনে রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষমতা অসাধারণ। শক্ত মানুষের সমবেত শক্তি মানববিরোধী অচলায়তন ভাঙার অন্যতম প্রেরণা তো বটেই।"[১৬]

দাদাঠাকুর-পঞ্চকের গান চিরস্থির অচলায়তনকে সচল করেছে। গানের গতিপ্রবাহের ভেতর দিয়ে সেখানকার অনড় বাসিন্দারা নড়েচড়ে বসেছে। শুধু তো 'অচলায়তন' নয়। 'রূপক-সাংকেতিক' পর্যায়ের শারদোৎসব-ফাল্গুনী-রাজা-মুক্তধারা-রক্তকরবী প্রায় সব নাটকেই ভিন্ন ভিন্ন 'অচলায়তন' আছে। রবীন্দ্রসংগীত সেইসব 'অচলায়তন' ভাঙার ক্ষেত্রেও তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করেছে।

'প্রবাসী' পত্রিকায় অচলায়তনের প্রকাশ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লেখেন—

> "শেষকালে নাটকটা প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি-কাটাকাটি চলবে এই আমার এক মস্ত সান্ত্বনা।"[১৭]

এ অনুমান সঠিক ছিল। নাটকটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথকে নানাবিধ সমালোচনার সামনে দাঁড়াতে হয়। অনেকেরই মনে হয়েছিল যে তিনি হিন্দুধর্মকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আঘাত করার জন্যই নাটকটি রচনা করেছেন। প্রবাসীতে অচলায়তন প্রকাশিত হলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায় একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। তাতে প্রশস্তি ও তিরস্কার দুটোই ছিল। তার জবাবে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ চিঠিটির মূল-অংশ তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক। অচলায়তন নাটকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পরিচয় এই চিঠিতে ধরা পড়েছে—

> "জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়, এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয়, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে। ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই, আচারের সৃষ্টি; কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই-সমস্ত আচারকে নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড়ো হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মতো আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়,

তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মতো পড়িয়া থাকে—বস্তুত তখন তাহা তপ্ত মরুভূমি, তৃষাহরা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সন্ধান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসিত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয়?...”[১৮]

ধর্ম নয়, ধর্মকে কেন্দ্রে রেখে ক্রমবর্ধমান আচারের বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। ধর্মের সর্বজনীন সত্যকে তিনি কখনই আঘাত করতে চান নি। ধর্ম যখন শাশ্বতকে অস্বীকার করে নিজের অহমিকাকে জাহির করতে চায় তখন তাকে পরাভূত করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। ধর্মের সত্য ও মুক্ত স্বরূপকে একমাত্র গুরুই চিনিয়ে দিতে পারেন। যুগে যুগে সবধর্মেই গুরুর আবির্ভাব দিকভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছে—

“প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে। সেই অহং-এর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকমাত্রের একটা ব্যগ্রতা আছে। তাহার কারণ কী। তাহার কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার আপনাকেই ব্যক্ত করিতে থাকে, আপনার চেয়ে বড়োকে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। আপনার অহংকার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বেষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাঁহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকেন তখন তাঁহার মানবজীবন সার্থক হয়। ধর্মসমাজেরও সেইরূপ একটা অহং আছে। তাহার অনেক রীতি-পদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহংকারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে সত্যধর্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অনুভব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই-সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোনো গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।...”[১৯]

অচলায়তন নাটকে গুরুর ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুব পরিষ্কার।

"অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন। গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই 'না, যাইতে পারিবে না--যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে'? গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।..."[২০]

নাটকে মন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্লেষ প্রকাশ করেছেন বলে তাঁর দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। তারও জবাব তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দিয়েছেন। ধর্ম নয়, আচার বড়ো হয়ে উঠেছে। ধর্মের শব্দসর্বস্ব শুষ্ক মন্ত্রের ফাঁদ সম্বন্ধে তিনি আমাদের অবহিত করেছেন। মানুষ যখন কৃত্রিম বন্ধন থেকে নিজেকে উদ্ধার করে ভক্তমনের রসের সন্ধানে একান্ত আকুল হয়ে ওঠে ঠিক তখনই গুরু এসে হাজির হন। ধর্মের সংকীর্ণতা নয়, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন ধর্মের মানবিক দিকের সূক্ষ্ম উন্মোচন—

"অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ কথা সত্য হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়। কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে। কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না। তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে। তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানা প্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায়

মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মানুষের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্ক জিনিস আর কী হইতে পারে। যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন-জাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তির সজীবতা ও সরলতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরে তখনই তো মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন; তিনি বলেন, পাথরের টুকরা দিয়া রুটির টুকরার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অনুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা কেহই বলে না যে, মন্ত্র যেখানে মননের সহায়, বাহিরের অনুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবস্ফূর্তির অনুগত, সেখানে তাহা নিন্দনীয়। ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেননা, সে যতদিনই বাঁচিবে ততদিনই কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে প্রবল করিতে চাহিবে সেইখানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। ... শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন; যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্তবালু-বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। এ কথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে; ইহা সকল দেশেই সকল মানুষেরই কথা। অবশ্য এই সর্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীর রূপ ধারণ করিয়াছে; তাহা যদি না করিত তবে উহা অপাঠ্য হইত।...”[২১]

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অচলায়তনের আলোচনা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অক্ষয়চন্দ্র সরকার রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে তারও মোক্ষম ও অসমসাহসী জবাব দিয়েছেন—

"আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম; আমি শীতলভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা। অবস্থাবিশেষে ক্রোধের উত্তেজনাই সত্যকে স্বীকার করিবার প্রথম লক্ষণ, এবং বিরোধই সত্যকে গ্রহণ করিবার আরম্ভ। যদি কেহ এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন যে, জগতের মধ্যে কেবল আমাদের দেশেই ধর্মে ও সমাজে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা ও বিকৃতি নাই, অথচ বাহিরে দুর্গতি আছে, তবে সত্যের সংঘাত তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে না, তিনি সত্যকে আপনার শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন। তাঁহাদের মন রক্ষা করিয়া যে চলিবে হয় তাহাকে মূঢ় নয় তাহাকে ভীরু হইতে হইবে। নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ভালোবাসিবে সে'ই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ... আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেদিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। ... আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত দেশ-ব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই—এই পাষাণ প্রাচীরের চারিদিকেই তাহার মাথা ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না। ... অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে। ... দোহাই আপনাদের, মনে করিবেন না, অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকলে নাড়া দিয়াছি; সে শিকল আমার, এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে। বাজিবে না তো কী! শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাইতেই হইবে। যে নিজে অনুভব

করিতেছে সে অনুভব না করাইয়া বাঁচিবে কী করিয়া। ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না। গালিকেই আমার চেষ্টার সার্থকতা মনে করিয়া আমি মাথায় করিয়া লইব, আর-কোনো পুরস্কার চাই না।"[২২]

রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের ভেতর দিয়ে আমাদের সচলায়তনে উপনীত করতে চেয়েছেন। আমাদের বোধকে জাগ্রত করে আমাদের সচেতন ও উজ্জীবিত করে সঞ্জীবনী সুধার স্পর্শ দিয়ে বিশ্বজনীন করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। 'আমার ধর্ম' রচনায় তিনি বলেছেন—

"যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, 'দুরগং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'-দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তাকে শত্রু বলেই মনে করি; তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়। কেননা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য: অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন পথ দিয়ে এলে! তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করলে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।...

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।"[২৩]

অচলায়তনের সৌজন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় যেভাবে উঠে এসেছে তা খুবই স্মরণীয়—

> "আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মনের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন, তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চলছিল।"[২৪]

শুধু তো রবীন্দ্র-সমকালীন ভারতবর্ষ নয়, আজকের ভারতবর্ষও অচলায়তন নাটকটিকে কতটা মেনে নিতে সক্ষম সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, বাংলাসাহিত্যের দিকপাল সমালোচকেরাও অচলায়তন নিয়ে দিকভ্রষ্ট হয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। উদাহরণ—

> "ইহাতে যদিও রূপকের স্পর্শ আছে, কিন্তু সেই স্পর্শের মধ্যে রহস্যঘন লীলা-চঞ্চল সুরটি বেশ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশ পায় নাই। ইহার প্রধান বিষয় হইতেছে জরাজীর্ণ, কুসংস্কার-কীট-জর্জর হিন্দু ধর্মের উপর আক্রমণ; এবং এই আক্রমণের মাত্রাধিক্যই রহস্যের সুরটির অবাধ ও সাবলীল প্রকাশে বাধা দিয়াছে।"[২৫]

বিদগ্ধ সমালোচকের মনের গতিবিধি বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। বিষয়বস্তুর উপর দায় চাপিয়ে তিনি সুকৌশলে রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণকারীর রূপ দিয়েছেন। যেন বিষয়বস্তুটাই সব নষ্টের মূলে! নাটকের মানবিক দিকটি অনেকের মতো তাঁরও দৃষ্টির বাইরেই থেকে গেছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রথাগত। তিনি অহেতুক 'আক্রমণ' শব্দের উপর বিশেষ জোর আরোপ করে সমালোচনার প্রথাগত স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। বিষয়বস্তুর দোহাই দিয়ে এ রকম বিরূপ সমালোচনা শিল্প-সাহিত্যের আঙিনায় একেবারেই সঠিক পদক্ষেপ নয়।

যেন বিষয়বস্তু অন্যকিছু হলেই সবকিছু গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত, এই ভাবনাটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। অচলায়তনে গানের চমৎকার ব্যবহার এবং চিত্রকল্পের অসামান্য প্রয়োগের দিকে মনোনিবেশ করলেই নাটকটির অসাধারণত্ব খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কিন্তু সমালোচক প্রবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি মারাত্মক অবিচার ও বিদ্রুপ করে বসেছেন—

> "যে-সমস্ত যুক্তিহীন সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিদ্রুপের লক্ষ্যস্থল হইয়াছে, তাহারা নিজ বার্ধক্যের ভারে ও যুগধর্মের স্বাভাবিক প্রভাবে জীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রবন্ধে ও কবিতায়, উপন্যাসে ও তত্ত্বালোচনায় চারিদিক হইতে তাহাদের উপর যে তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হইয়াছে, তাহাতে একেবারে অমর না হইলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য। এরূপ অবস্থায় আবার নাটকের পৃষ্ঠায় তাহাদের বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধক্ষেত্র রচনা অনেকটা বৃথা শক্তি-ব্যয় বলিয়াই মনে হয়।"[২৬]

সমালোচক প্রবর বিষয়বস্তুর ঘেরাটোপ থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। তাছাড়া বিষয় এক হলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পমাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না—এ রকম কোনো বিধিনিষেধ কি শিল্পীর উপরে চাপানো যায়? রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো রচনা সম্বন্ধে 'বৃথা শক্তি-ব্যয়'—এর অভিযোগ না তুলে তিনি চুপ থেকেছেন কেন? ডাকঘরের পরবর্তীকালে রচিত উৎসর্গের ৮ নং কবিতা "আমি চঞ্চল হে"[২৭] ... যা একটি উৎকৃষ্ট গান হিসেবেও স্বীকৃত যাতে অমলের ভাবচ্ছবি আছে—'বৃথা শক্তি-ব্যয়' হিসেবে এ দুটোর একটাকে বিসর্জন দিতে হবে? বিশ্বসাহিত্যের এত বড়ো সর্বনাশ পাঠক মেনে নেবেন? আসল কথা তাঁর অবচেতন মনে সংস্কার কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মকে 'আক্রমণ' করেছেন ধরে নিয়ে তিনিও 'প্রতিআক্রমণ' করে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রতিশোধ তুলেছেন।

অচলায়তনের সমস্যা রবীন্দ্র-সমকালে এবং আজকের ভারতবর্ষেও সমানভাবে বিরাজমান। আমাদের রাজনৈতিক আঙিনা জাতীয়তাবাদের নামে ধর্মকে হাতিয়ার করে ধর্মীয় জিগিরের মুক্তাঞ্চলে পর্যবসিত। ভারতবর্ষের এই সমস্যাকে তিনি অনেক আগেই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। সেজন্য সনাতন হিন্দুধর্মের নামে আচারসর্বস্বতার উপদ্রব থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন নাটকটি লিখেছিলেন। নাট্যশিল্প যে একই সঙ্গে সমকালের

এবং চিরকালের তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অচলায়তন নাটকটি। নাটকের উপাদানের মধ্যে দিয়েই অচলায়তন সমকাল ও চিরকালের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।

দুই

রাজা নাটকের দ্বন্দ্ব যেমন আলো ও অন্ধকারের প্রধান দুই চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে ঠিক তেমনই অচলায়তনও পাথর এবং আকাশ এই দুই প্রধান চিত্রকল্পে দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছে। নাটকের নামের মধ্যেই চিত্রকল্পের একটা আভাস আছে। 'আয়তন'-এর মধ্যে যে জ্যামিতিক ভূ-খণ্ডের ইশারা সেই ভূ-খণ্ডটি 'অচল'। সনাতন সাধনার কঠিন নিয়মের জাঁতাকল পাথরের এই 'আয়তন'-এর আবাসিকদের একেবারে জীবনহীন জীবনের দিকে চালিত করেছে। জীবনকে করে তুলেছে 'অচল'। ফলে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সেজন্য মুক্তির চিত্রকল্প হিসেবে উঠে এসেছে আকাশ। একদিকে নেতিবাচক গণ্ডিবদ্ধ স্থিরতার অবৈজ্ঞানিক সাধনা, যার ভরকেন্দ্রে মহাপঞ্চক, উপাচার্য প্রভৃতিরা রয়েছেন। রয়েছে পাথরের প্রাকারের অন্তরালে অচলায়তন নামক এক কারাগার। আর একদিকে অবস্থান করছে গতির চিরকালীন সাধনা, যার কেন্দ্রে রয়েছে পঞ্চকের মুক্তিকামী মনন, আচার্যের সমর্থন এবং "শতদল পদ্ম"[২৮] দাদাঠাকুরের ইতিবাচক ভূমিকা।

প্রথমে পাথর চিত্রকল্পের আলোচনায় মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

"উপাচার্য : ... বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি।..."[২৯]

"উপাচার্য : ...আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো... শক্ত হয়ে জমে গেছে।..."[৩০]

সুদীর্ঘকালের কৃচ্ছ্রসাধনায় অভ্যস্ত উপাচার্যের নিয়মতান্ত্রিক একঘেয়ে জীবনকে পাথরের চিত্রকল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এঁদের মতো আচারসর্বস্ব নিরানন্দ মানুষের জীবনের সারসত্য উপাধ্যায়ের উক্তিতে ধরা পড়েছে—

"... তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।"[৩১]

অর্থাৎ পাথরের মতো নিষ্প্রাণ ও নিশ্চল জীবনকে এঁরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছেন। সেজন্য অচলায়তনের দম বন্ধ জীবনের পক্ষে এঁদের অবস্থান খুব দৃঢ় এবং নিষ্ঠুরতার ভেতর দিয়ে এঁদের আত্মপ্রকাশ। সহজকে এঁরা সহজে মেনে নিতে অক্ষম। কিন্তু অন্য একটি পক্ষও এই নাটকে আছে। তাই—

"আচার্য : ... আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত।..."[৩২]

আচারসর্বস্ব ধর্মে আচার্যের আস্থা নেই। তাই তাঁর একান্ত অনুভব এবং বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে পাথর ও সহযোগী চিত্রকল্প ধরা দেয় ভিন্ন রূপে--

"আচার্য : ... এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই-সব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি—সমস্তই স্বপন।"[৩৩]

হাজার বছরের প্রাচীন আচার আচার্যের কাছে সত্য নয় স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে। তাই তিনি মন্ত্রের উপরে মনকে স্থান দিয়েছেন।

"উপাচার্য : ... পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়!..."[৩৪]

মহাপঞ্চকের পাথরপ্রতিম রসহীন চরিত্রের বিপরীতে পঞ্চকের আকাশবিহারী মুক্তিকামী চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ঘাস চিত্রকল্পের প্রয়োগ নাটকের মূল পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করেছে। আচার-সর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতায় মুক্তি মেলে না। মুক্তি মেলে সহজ প্রাণের অকৃত্রিমতায়। ঘাস চিত্রকল্পের মাধ্যমে সেই সত্যকে রূপ দেওয়া হয়েছে।

"প্রথম শোণপাংশু : ... তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো-সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে,..."[৩৫]

দমবন্ধ জীবনের বিপরীতে শোণপাংশুদের অবস্থান। তাদের জীবন আনন্দে ভরা। নৃত্যময়। কর্মচঞ্চল। আনন্দের বিগ্রহ দাদাঠাকুরকে তারা অচলায়তনের নীরস জীবনে রসের আনন্দধারা বলে মনে করে। পাথর চিত্রকল্পে এখানে তাই নাচের ছন্দ। মুক্তির আভাস।

"মহাপঞ্চক : ... ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।"[৩৬]

মহাপঞ্চকের মনেও আশঙ্কার মেঘ। অথচ তিনি একজন কঠোর তপস্বী। তাঁর উক্তিতেও একটা বিচলিত ভাব। কঠিন নিষ্ঠার বন্ধনে অভ্যস্ত তিনি। তাঁর নিয়মের নিগড়ে বাঁধাধরা জীবনে যেন কোথাও একটা খোলস খসে পড়ার ইঙ্গিত 'অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।' —এই কথার মধ্যে ধরা পড়েছে।

"পঞ্চক ... পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে;"[৩৭]

পঞ্চকের উক্তিতে মুক্তির আনন্দচিত্র। মহাপঞ্চকের কঠিন সাধনার কঠোর কর্তব্যের বিপরীতে মুক্তিপথের ভবিষ্যতের ছবি এখানে রূপ পেয়েছে।

"আচার্য : ... হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে,..."[৩৮]

আচার্যের মনে সংশয়। প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। সেজন্য বালক সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্ত করার আয়োজন এবং তার অবোধ শিশুমনের সংস্কার তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

"আচার্য : ... আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল।..."[৩৯]

আচার্যের মনের ভেতর চেপে বসা দ্বিধার ভার দর্ভকদের সান্নিধ্যে এসে সহজ পথের সন্ধান পেয়েছে তারই ছবিটি ধরা আছে উল্লিখিত পাথরের চিত্রকল্পে। এখানে আচার্যের মনের ব্যথার উপশম ঘটেছে। এর ফলে তাঁর মন আগের চেয়ে আরও অধিক স্পষ্ট রেখায় পথ খুঁজে পেয়েছে। তাঁর বিদ্রোহী মন সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তাই পঞ্চককে উদ্দেশ্য করে বলা আচার্যের বক্তব্যে পাথরের চিত্রকল্প ধরা দিয়েছে এভাবে—

"ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। ... ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।"[৪০]

তাঁর সংশয় কেটে গেছে। যাপিত অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, 'পাষাণের বেড়া'র মতো প্রতিবন্ধক আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু এই প্রতিবন্ধক অস্থায়ী। তাই দাদাঠাকুরের কাছে তাঁর একান্ত নিবেদন—

"আচার্য : ... আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাই নে—আমাকে একটু রস দাও।"[৪১]

এভাবে নীরস-নিরানন্দ জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য পিপাসা পাথরের চিত্রকল্পে পাথরের বেড়া ভাঙার অভিভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

পাথরের সৌজন্যে প্রায় একই অর্থে আমরা পেয়ে যাই লোহার চিত্রকল্প—

"মহাপঞ্চক : তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে।"[৪২]

এই অন্ধ-বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে হাজার বছরের অন্ধ-সংস্কার। পাথর ও লোহা চিত্রকল্প দুটি তাই প্রায় সমার্থক হয়ে উঠে মহাপঞ্চকদের অনড় ও কঠিন নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি নিঃশর্ত আস্থাজ্ঞাপক হয়ে ধরা দিয়েছে। শুধু কি তাই? এই অন্ধত্বের শিকড় অনেক গভীরে। তাই তো মহাপঞ্চকের উক্তিতে পাথর, লোহা এমনকি তাঁর ইন্দ্রিয়ের 'দ্বার'গুলি পর্যন্ত সমার্থক চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে—

"মহাপঞ্চক : পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।"[৪৩]

মানবেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত কঠোর সনাতন ধর্মাচরণের নামে পদে পদে লঙ্ঘিত হয়েছে। ফলে নিরানন্দ অভ্যেসের দাসত্ব স্থির অন্ধকারের চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে—

"উপাচার্য। ... প্রথম ঊষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিই নি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য ও ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি।..."[৪৪]

অচলায়তন নাটকে পাথরের বিপরীতে স্থান পেয়েছে আকাশ চিত্রকল্পটি। এই অনন্ত আকাশ মুক্তির বারতা নিয়ে নাটকে উপস্থিত হয়েছে। অচলায়তনের রুদ্ধ জীবন আর তার বাইরের পৃথিবীতে আলো ঝলমলে দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ পঞ্চকের মনে আলোড়ন তুলেছে—

"পঞ্চক : ... আকাশে কার ব্যাকুলতা,..."[৪৫]

"পঞ্চক : ... এরা একটু থেমেছে অমনি আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে।..."[৪৬]

"পঞ্চক : ...আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার বুকের ভিতর গিয়ে কথা কচ্ছে, আমার সমস্ত শরীরটা গুন গুন করে বেড়াচ্ছে।"[৪৭]

আকাশের সঙ্গে পঞ্চকের সম্পর্ক খুব নিবিড়। তাই দাদাঠাকুরের উক্তিতে পঞ্চক মুক্তির দূত—

"দাদাঠাকুর : ... খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে আশীর্বাদ করছে—"[৪৮]

অচলায়তন একটা খাঁচা। আবাসিকরা সব বন্দী পাখি। তারা অভ্যেসের দাস। মুক্তির প্রশ্নে সেজন্য যেন দ্বন্দ্বময় আকাশের চিত্রকল্প ধরা দিয়েছে পঞ্চকের উক্তিতে—

"পঞ্চক : খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সব চেয়ে ডরায়।..."[৪৯]

অচলায়তনের মুখ্যপুরুষ স্বয়ং আচার্য। এই আয়তন নিয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর মনের মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব। এখানকার নিষ্প্রাণ আচার তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পঞ্চকের মধ্যে তিনি মুক্তির আনন্দপিপাসা মেটান। পঞ্চক সেটা বুঝতে পারে—

"পঞ্চক : ... যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন।..."[৫০]

চেষ্টার দ্বারা যে সব রকমের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা যায় আকাশের সে রকম চিত্রকল্পেরও নমুনা আছে জল, মেঘ, দিগন্ত, সংগীত ইত্যাদির অনুষঙ্গে—

"দাদাঠাকুর : যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়।..."[৫১]

"পঞ্চক : ...ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।"[৫২]

"দাদাঠাকুর : ... দিগন্তে ওই আকাশ পেতে আছে কান।"[৫৩]

"পঞ্চক : ... তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো।"[৫৪]

"পঞ্চক : ... যেমন করে গাইছে আকাশ

তেমনি করে গাও গো।

যেমন করে চাইছে আকাশ

তেমনি করে চাও গো।"[৫৫]

আকাশ কখনো বা অনিবার্য প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের আশ্রয় হয়ে দেখা দিয়েছে—

"দাদাঠাকুর : ...ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।"[৫৬]

"পঞ্চক : ... আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—"[৫৭]

"আচার্য : ... সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে।..."[৫৮]

দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে অচলায়তন প্রাচীরমুক্ত হয়েছে। আলোয় চারদিক একেবারে ভরে গেছে সীমাহীন মুক্তির আনন্দে। সমাসোক্তি অলঙ্কারে ভর করে সেই সময়কার প্রতিচ্ছবি অসামান্য আকাশের চিত্রকল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে—

"প্রথম বালক : ... সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।"[৫৯]

নাটকের শেষ লগ্নে আকাশের অন্তিম চিত্রকল্পে নবজীবন ও নবমিলনের স্পর্শ সহস্র ধারায় প্রবাহিত—

"দাদাঠাকুর : ... নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও।..."[৬০]

অচলায়তনে পাথরের সৌজন্যে যেমন ভিন্ন চিত্রকল্পের সমার্থক ইশারা পাওয়া যায় ঠিক তেমনই আকাশের সৌজন্যে ধরা দেয় ঝড়, বৃষ্টি, ঝর্ণা, জল, ঢেউ বা সমুদ্রের অর্থবহ সব চিত্রকল্প—

"দাদাঠাকুর : আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমার মনে হয় আমি ঝরনার ধারার সঙ্গে খেলছি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছি।"[৬১]

"পঞ্চক : ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই।..."[৬২]
"পঞ্চক : ... নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—"[৬৩]

"পঞ্চক : মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।"[৬৪]

"আচার্য : ঐ-যে নেমে এল বৃষ্টি-পৃথিবীর কত দিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি-অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।"[৬৫]

"দাদাঠাকুর : -আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—"[৬৬]

আকাশের অনন্তধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আলোর চিত্রকল্পটিও এ নাটকে বেশ মানানসই হয়ে ধরা দিয়েছে—

"দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে।..."[৬৭]

"তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।"[৬৮]

সর্বোপরি আলোকেন্দ্রিক "আলো, আমার আলো"[৬৯] গানটিতে মুক্তির আহ্বান তথা প্রাণের অবাধ আনন্দ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

পথের অনেকগুলি চিত্রকল্প এ নাটকে অনন্তের আভাস দিয়েছে। পঞ্চকের গানে—

১. "এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে—"[৭০]

২. "সুখে দুখে বুকের মাঝে

পথের বাঁশি কেবল বাজে,"[৭১]

দাদাঠাকুরের কথায়—

"ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।"[৭২]

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৮০-৩৮১

২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩০৪

৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮১

৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭১

৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭১

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭১

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭১

৮. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭২, পৃ. ৬৮

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪০৪

১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪০৫

১১. মানস মজুমদার : 'রবীন্দ্র-নাট্যে প্রতিবাদ : অচলায়তন', বাংলা সাহিত্যপত্রিকা, রবীন্দ্র-জন্ম সার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক বিশ্বনাথ রায়, পঁচিশে বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৪৫১

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ,

জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৬০

১৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৬০

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৫

১৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, নয়া উদ্যোগ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৭১-৭২

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭২

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৭৯ পৃ. ৫০৪

১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫০৬

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫০৬

২০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫০৬

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫০৬-৫০৭

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫০৮-৫১০

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫০৮-৫১১

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫০৮-৫১১

২৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য', বাংলা সাহিত্যপত্রিকা, রবীন্দ্র-জন্ম সার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক বিশ্বনাথ রায়, পঁচিশে বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৫৫

২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬০

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৯২

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৭৯

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৬৯

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭০

৩১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭৩

৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭০

৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭০

৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭০

৩৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭৯

৩৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৮

৩৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৮

৩৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৯

৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৩

৪০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

৪১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪০৬

৪২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৭

৪৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪০০

৪৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭০

৪৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৬১

৪৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭৮

৪৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭৮

৪৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮০

৪৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮১

৫০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮২

৫১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৩

৫২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৩

৫৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৩

৫৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৩

৫৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৩

৫৬. প্রাগুক্ত : পৃ : ৩৮৬

৫৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৮

৫৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

৫৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৮

৬০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪০৭

৬১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮০

৬২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮২

৬৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৮

৬৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৩

৬৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৫

৬৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪০৬

৬৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৭

৬৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৭

৬৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৯৮

৭০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭৪

৭১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪০৪

৭২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৬